ইলেকট্রনিক্স
Electronics

ইউনিট
১০

ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান যুগ হলো ইলেকট্রনিক্স এর যুগ। সেমিকন্ডাকটরকে ইলেকট্রনিক্স এর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, রাডার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতিতে ইলেক্ট্রনিক্স এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া, বাসা-বাড়ি, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, ব্যাংক ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। আধুনিক কম্পিউটার মানুষের জীবনের চলার পথকে সহকজতর করে তুলছে। যে কম্পিউটার আমাদেরকে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তির চরম উন্নতি সাধন করেছে সেটিও ইলেক্ট্রনিক্স এর অবদান। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় লো ভোল্টেজে, শূন্যস্থানে, গ্যাসে অথবা কঠিন মাধ্যমে ইলেকট্রনের গতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ইলেকট্রনিক্স বলে। বিভিন্ন ধরনের সেমিকন্ডক্টার ও ট্রানজিন্টরের আবিষ্কারের ফলে ইলেকট্রনিক্স এর ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেমিকন্ডাক্টার, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ও এর ব্যবহার, লজিক গেট সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ-১০.১ : পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী
Conductor, Insulator and Semiconductor

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.১.১ তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে কঠিন পদার্থকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো:

১. পরিবাহী
২. অপরিবাহী এবং
৩. অর্ধপরিবাহী।

১. পরিবাহী : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে।

সাধারণত ধাতব পদার্থ তড়িৎ সুপরিবাহী হয়। যেমন- তামা, রূপা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পরিবাহী। পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ অনেক কম হয় প্রায়– $10^{-8}\,\Omega m$ ক্রমের। রূপা হলো সবচেয়ে উত্তম ধাতব পরিবাহক। পরিবাহীতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। ফলে পরিবাহীর দুই প্রান্তে সামান্য বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।

২. অপরিবাহী : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অন্তরক বা অপরিবাহী বলে।

যেমন- কাচ, কাঠ, রাবার, পণ্ডাস্টিক ইত্যাদি অপরিবাহী পদার্থ। অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা খুব কম এবং আপেক্ষিক রোধের মান অত্যন্ত বেশি। অন্তরক পদার্থের আপেক্ষিক রোধ প্রায় $10^{12}\,\Omega m$ ক্রমের।

৩. অর্ধপরিবাহী : যে সকল পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা অপরিবাহী ও পরিবাহীর মাঝামাঝি সেসব পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে।

যেমন– জার্মেনিয়াম, সিলিকন, গেলিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থ। অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ পরিবাহী এবং অন্তরকের আপেক্ষিক রোধের মাঝামাঝি। এদের আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\,\Omega m$ থেকে $10^{-2}\,\Omega m$ ক্রমের। কিন্তু কেবল

আপেক্ষিক রোধ দিয়েই অর্ধপরিবাহী চিহ্নিত করা যায় না। কেননা এমন কিছু সংকর ধাতু ও আছে যাদের আপেক্ষিক রোধ জার্মেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির সমক্রমের কিন্তু এগুলো অর্ধপরিবাহী নয়। অর্ধপরিবাহীর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য

১। পরম শূন্য তাপমাত্রায় (0 K) এরা অন্ড্রকের ন্যায় কাজ করে।

২। কক্ষ তাপমাত্রায় সাধারণত আপেক্ষিক রোধ $10^{-4}\Omega m - 10^{-2}\Omega m$ এর মধ্যে থাকে।

৩। অর্ধপরিবাহীর সাথে কোনো অপদ্রব্য যোগ করলে এর তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়।

৪। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পালণ্ঢা পর্যন্ড় এর রোধ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়।

৫। এদের পরিবহন ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি পার্থক্য 1.1 eV বা এর চেয়ে কম।

৬। কক্ষ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীর পরিবহন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ ও যোজন ব্যান্ড আংশিক খালি থাকে।

সার-সংক্ষেপ :

১. **পরিবাহী :** যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে তাদেরকে পরিবাহী বলে।
২. **অপরিবাহী :** যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অন্ড্রক বা অপরিবাহী বলে।
৩. **অর্ধপরিবাহী :** যে সকল পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা অপরিবাহী ও পরিবাহীর মাঝামাঝি সেসব পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?
(ক) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে রোধ বৃদ্ধি পায় (খ) প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে।
(গ) পরম শূন্য তাপমাত্রায় এরা অন্ড্রকের ন্যায় আচরণ করে। (ঘ) এদের পুরমানুর মধ্যে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান।

২। নিচের কোন পদার্থটি অর্ধপরিবাহী?
(ক) কাচ (খ) রূপা (গ) গেলিয়াম (ঘ) সিরামিক

পাঠ-১০.২ : ব্যান্ড তত্ত্ব

Band Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কঠিন পদার্থের ব্যান্ড তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যান্ড তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে পদার্থের গাঠনিক উপাদান পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত ঋণাত্মক চার্জগ্রস্ড় কণিকা ইলেকট্রনের অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইলেকট্রনের এই শক্তিকে শক্তিস্ড়র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১০.২.১ শক্তি স্ড়র (Energy Levels) : বোরের পরমাণু তত্ত্ব অনুসারে আমরা জানি যে, ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসকে কেন্দু করে কতকগুলো অনুমোদিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এই কক্ষপথগুলোর ব্যাসার্ধ সুনির্দিষ্ট। এই কক্ষপথগুলোর সাথে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি জড়িত থাকে। **পরমাণুর ইলেকট্রন যে কক্ষপথে আবর্তন করে সেই কক্ষপথের শক্তি ধারণ করে। ইলেকট্রনের কক্ষপথগুলোর শক্তিকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট শক্তি স্ড়র হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এই স্ড়রগুলোকে ইলেকট্রনের শক্তি স্ড়র বলে।** ইলেকট্রনের প্রথম কক্ষপথের শক্তিকে প্রথম শক্তি স্ড়র এবং দ্বিতীয় কক্ষপথের শক্তিকে দ্বিতীয় শক্তি স্ড়র ইত্যাদি হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

ইলেকট্রনের কক্ষপথ যত বড় হয়, ইলেকট্রনের শক্তিও তত বেশি হয়। ফলে শক্তি স্ড়রও তত উচ্চ হয়। পরমাণুতে ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষ পথের সাথে সংশিণ্টষ্ট শক্তিকে একটি রৈখিক চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই চিত্রকে শক্তি স্ড়র রৈখিক চিত্র বলে [চিত্র ১০.১(খ)]।

কোনো পরমাণুর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1, r_2 ও r_3 হয় এবং শক্তি যথাক্রমে E_1, E_2 ও E_3 হয় তাহলে $E_3>E_2>E_1$ হবে [চিত্র ১০.১(ক)]।

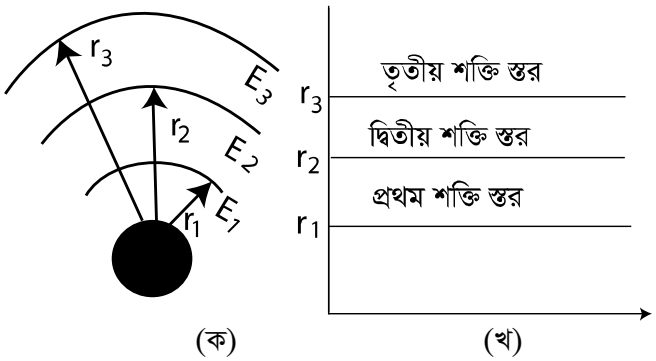

চিত্র ১০.১

প্রথম কক্ষপথের একটি ইলেকট্রনকে দ্বিতীয় কক্ষপথে আনতে হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি এতে সরবরাহ করতে হয়। পরমাণুর এই অবস্থাকে উত্তেজিত অবস্থা বলে। পুনরায় ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় কক্ষপথ থেকে প্রথম কক্ষপথে ফিরে আসলে গৃহীত শক্তি তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ হিসেবে নিঃসরণ করবে।

১০.২.২ শক্তি ব্যান্ড
Energy Band

একটি বিচ্ছিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে, কোনো নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর একটি নির্দিষ্ট শক্তি থাকে।

অর্থাৎ শক্তির একটি নির্দিষ্ট মান থাকে। কিন্তু পরমাণুটি যদি একটি কঠিন পদার্থের অন্ড়র্ভুক্ত হয়, তখন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর শক্তির সেই সুনির্দিষ্ট মান থাকে না। বরং কোনো নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট শক্তির পরিবর্তে শক্তির একটি সীমা বা পালণ্ঢা থাকে। শক্তির এই পালণ্ঢাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রতিটি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন (Isolated) পরমাণুর সুনির্দিষ্ট শক্তি স্ড়র আছে, যেখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে। এই স্ড়রগুলোর মধ্যবর্তী শক্তি অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না। কিন্তু এই মুক্ত পরমাণুগুলো যখন একত্রিত হয়ে কেলাস বা ক্রিস্টাল গঠন করে তখন ঐ পরমাণুর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার জন্য ঐ ইলেকট্রনের কক্ষপথ প্রভাবিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রতিটি ইলেকট্রনের কক্ষপথ কেলাসের মধ্যে অন্যান্য আধান দ্বারা আংশিকভাবে হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়।

একটি কেলাসের মধ্যে প্রতিটি ইলেকট্রনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। ফলে, একই কক্ষপথে ঘূর্ণনরত ভিন্ন ভিন্ন ইলেকট্রনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্ড়র সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম কক্ষপথে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তি স্ড়র খুব সামান্য শক্তি ব্যবধানের জন্য হলেও ভিন্ন ভিন্ন। কেননা এই কক্ষপথের যেকোনো দুটি ইলেকট্রনের চারপাশের আধান পরিবেশ এক রকম থাকে না। একটি কেলাসে যেহেতু লক্ষ লক্ষ প্রথম স্ড়র ইলেকট্রন রয়েছে, সেহেতু প্রতিটি ইলেকট্রনের শক্তির খুব সামান্য পার্থক্যবিশিষ্ট শক্তি-স্ড়রগুলো মিলে প্রথম শক্তি ব্যান্ড তৈরি করে। একইভাবে অন্যান্য স্ড়রের ইলেকট্রনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ড তৈরি করে। সুতরাং একটি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন পরমাণুর সুনির্দিষ্ট শক্তি স্ড়র থাকে যাদের সরলরেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক পরমাণু দ্বারা গঠিত কেলাসে শক্তি ব্যান্ড তৈরি হয়।

সংজ্ঞা ঃ কোনো কঠিন পদার্থের কেলাসে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তি যে সীমা বা পালণ্ঢার মধ্যে অবস্থান করে তাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট শক্তি হলো প্রথম শক্তি ব্যান্ড। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কক্ষপথের ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট শক্তি ব্যান্ডকে যথাক্রমে দ্বিতীয় শক্তি ব্যান্ড ও তৃতীয় শক্তি ব্যান্ড বলে। [চিত্র ১০.১]

গুর"ত্বপূর্ণ ব্যান্ডসমূহ

যদিও কঠিন বস্তুতে অনেকগুলো শক্তি ব্যান্ড থাকে, তার মধ্যে তিনটি ব্যান্ড হচ্ছে প্রধান। এগুলো হলো –

(ক) যোজন ব্যান্ড
(খ) পরিবহন ব্যান্ড
(গ) নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড

(ক) **যোজন ব্যান্ড (Valence Band) : পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজন ইলেকট্রন বলে। কঠিন বস্তুতে পরমাণুর যোজন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পালণ্ডা বা ব্যান্ডকে যোজন ব্যান্ড বলে [চিত্র ১০.২]।**

একটি সাধারণ পরমাণুর দূরতম কক্ষপথের যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রনের শক্তি সবচেয়ে বেশি, কিন্তু এদের বন্ধনশক্তি সবচেয়ে কম। যোজন ব্যান্ড কখনও ইলেকট্রন শূন্য থাকে না। এই ব্যান্ড পূর্ণ বা আংশিক পূর্ণ থাকতে পারে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে যোজন ব্যান্ড পূর্ণ থাকে। ফলে এ গ্যাসগুলো নতুন কোনো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে না। অন্যান্য পদার্থের ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে। আংশিক পূর্ণ যোজন ব্যান্ড আরো কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু যোজন ব্যান্ডের হোল তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে।

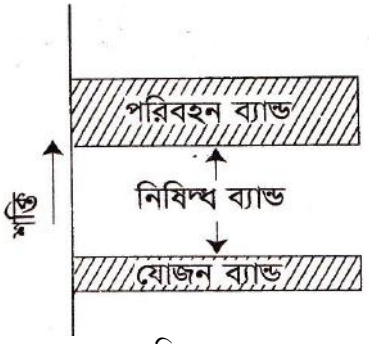

চিত্র ১০.২

(খ) পরিবহন ব্যান্ড (Conduction Band) : কোনো কোনো পদার্থে বিশেষ করে ধাতব পদার্থের যোজন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে খুব শিথিলভাবে যুক্ত থাকে। এমনকি কক্ষ তাপমাত্রায় কিছু কিছু যোজন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল মুক্ত ইলেকট্রন পরিবাহীতে তড়িৎ পরিবহনে ভূমিকা রাখে।

পরমাণুতে অবস্থিত মুক্ত যোজন ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহনে অংশ গ্রহণ করে বলে এদেরকে পরিবহন ইলেকট্রন বলে। পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে পরিবহন ব্যান্ড বলে [চিত্র ১০.২]।

পরিবহন ব্যান্ডের সকল ইলেকট্রন মুক্ত ইলেকট্রন। পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ইলেকট্রন শূন্য অথবা আংশিক পূর্ণ থাকতে পারে। যদি কোনো পদার্থের পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে, তাহলে ঐ পদার্থে তড়িৎ পরিবহন সম্ভব নয়। ঐ জাতীয় পদার্থকে অন্ড়রক বলে। সাধারণত, অন্ড়রক পদার্থের পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে এবং পরিবাহীর পরিবহন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে। পরিবহন ব্যান্ডের অবস্থান যোজন ব্যান্ডের উপরে থাকার কারণে পরিবহন ব্যান্ডের ইলেকট্রনের শক্তি যোজন ব্যান্ডের ইলেকট্রনের শক্তির চেয়ে বেশি থাকে।

(গ) নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড (Forbidden Enegry gap) : সাধারণত যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে ইলেকট্রনের কোনো শক্তি স্ড়র বিদ্যমান থাকে না । এজন্য এ স্থানকে নিষিদ্ধ ব্যান্ড (Forbidden band) বলে ।

শক্তি স্ড়র রৈখিক চিত্রে পরিবহণ ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী শক্তির পালণ্ডাকে নিষিদ্ধ [চিত্র ১০.২] শক্তি ব্যান্ড বলে। শক্তি ব্যান্ড চিত্রে যোজন ব্যান্ডের সর্বোচ্চ শক্তি স্ড়র এবং পরিবহন ব্যান্ডের সর্বনিম্ন শক্তি স্ড়রের মধ্যবর্তী ব্যবধানই নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান। একে E_g দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নিষিদ্ধ শক্তি ফাঁক বা অঞ্চলে কোনো অনুমোদিত শক্তি-স্ড়র না থাকায় এই অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রন থাকতে পারে না। নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান এর প্রস্থ যোজন ইলেকট্রনগুলোর পরমাণুর সাথে বন্ধনের মাপকাঠি। কোনো পদার্থের নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান যত বেশি হবে, যোজন ইলেকট্রনগুলোও নিউক্লিয়াসের সাথে তত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকবে। কোনো ইলেকট্রনকে যোজন ব্যান্ড থেকে পরিবহন ব্যান্ডে নিতে হলে অর্থাৎ একে মুক্ত করতে হলে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধানের সমপরিমাণ শক্তি বাইরে থেকে সরবরাহ করতে হবে। বিভিন্ন পদার্থের নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বিভিন্ন।

১০.২.৩ ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অন্ড়রক
Conductor, Semiconductor & Insulator in terms of Band Theory

আমরা জানি, কিছু কিছু কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে। এগুলো সুপরিবাহক পদার্থ। আবার এমন কিছু পদার্থ আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে আদৌ তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। এদেরকে অন্ড়রক পদার্থ বলে। এদের মাঝামাঝি শ্রেণির কিছু পদার্থ আছে যেগুলোকে অর্ধপরিবাহী বলে। তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্মের উপর ভিত্তি করে কঠিন পদার্থের প্রকৃতিগত এই পার্থক্য শক্তি ব্যান্ডের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

পরিবাহী : যে সব পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন থাকে এবং যেগুলোর মধ্য দিয়ে খুব সহজে তড়িৎ প্রবাহ চলাচল করতে পারে সে সব পদার্থকে পরিবাহী বলে। যেমন : তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রূপা, লোহা ইত্যাদি পরিবাহী।

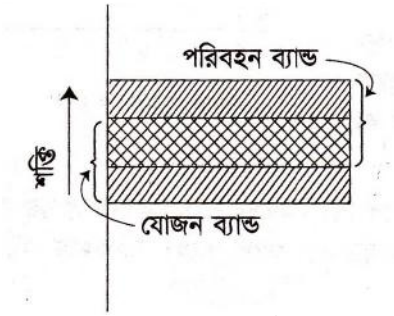

চিত্র ১০.৩ : পরিবাহীর শক্তি ব্যান্ড।

পরিবাহীতে যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মাঝে কোন শক্তি ব্যবধান থাকে না। অর্থাৎ E_g এর মান শূন্য হয়। এক্ষেত্রে পরিবাহীর যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ড এর মধ্যে আংশিক উপরিলেপন ঘটে [চিত্র: ১০.৩] কাজেই যোজন ইলেকট্রন খুব সহজেই পরিবহন ইলেকট্রনে পরিণত হতে পারে। এই উপরিলেপনের জন্য, পরিবাহীর দুই প্রান্তে খুব সামান্য বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। পরিবাহীতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন থাকার ফলে এদের রোধ খুব কম হয় অর্থাৎ তড়িৎ পরিবাহিতা বেশি হয়।

অন্তরক বা অপরিবাহী : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলতে পারে না তাদেরকে অপরিবাহী বা অন্তরক বলে।

শক্তি ব্যান্ডের আলোকে, অন্তরক পদার্থের যোজন ব্যান্ড ইলেকট্রন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে। এ ছাড়া যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি ব্যবধান অনেক বেশি হয়। অন্তরকের শক্তি ব্যবধান 6 eV হতে 15 eV এর মতো হয় [চিত্র-১০.৪]। উদাহরণস্বরূপ হীরকের নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান হলো 6eV । যেহেতু অন্তরক পদার্থের যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ থাকে, ফলে এসব পদার্থে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। শক্তি ব্যবধান অনেক বড় হওয়ায় শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যোজন ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে না। অর্থাৎ পরিবহন ব্যান্ড প্রায় ফাঁকাই থাকে। ফলে এসব পদার্থের মধ্য দিয়ে কোনো ইলেকট্রন প্রবাহ তথা তড়িৎ প্রবাহিত হয় না এবং এগুলো অন্তরকের ন্যায় কাজ করে।

চিত্র ১০.৪

অর্ধপরিবাহী : অর্ধপরিবাহী হলো সেই সব পদার্থ, যাদের তড়িৎ পরিবাহিতা পরিবাহী এবং অন্তরক পদার্থের মাঝামাঝি। অর্ধপরিবাহী পদার্থের শক্তি ব্যান্ড কাঠামো অন্তরক পদার্থের অনুরূপ। কিন্তু অর্ধপরিবাহী পদার্থের নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধানের মান অন্তরক পদার্থের তুলনায় অনেক কম।

পরম শূন্য তাপমাত্রায় যে সকল পদার্থের যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণরূপে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা থাকে এবং নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান অত্যন্ত কম ($E_g \approx 1$ eV) হয় সেসব পদার্থকে অর্ধপরিবাহী বলে। জার্মেনিয়াম, সিলিকন, গেলিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থ। কক্ষ তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীর যোজনব্যান্ড প্রায় পূর্ণ এবং পরিবহন ব্যান্ড প্রায় খালি থাকে।

উদাহরণস্বরূপ- জার্মেনিয়াম এবং সিলিকনের ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবধানের মান যথাক্রমে 0.72eV থেকে 1.1eV। 0 K বা পরম শূন্য তাপমাত্রায় ইলেকট্রন এই ক্ষুদ্র শক্তি ব্যবধান অতিক্রম করে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে না ফলে পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা থাকে। ফলে পরম শূন্য তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী অন্তরকের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু কক্ষ তাপমাত্রায় যোজন ব্যান্ডের কিছু ইলেকট্রন তাপীয় শক্তি অর্জন করে পরিবহন ব্যান্ডে চলে যায়।

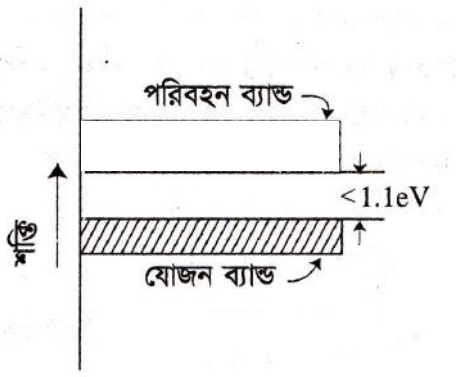

চিত্র ১০.৫

ফলশ্রুতিতে এগুলো তড়িৎক্ষেত্র তথা বিভব পার্থক্য প্রয়োগের ফলে মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবহন ব্যান্ডে ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অর্ধপরিবাহীর রোধের উষ্ণতা গুনাংকের মান ঋণাত্মক।

সার-সংক্ষেপ :

শক্তি স্তর : পরমাণুর ইলেকট্রন যে কক্ষপথে আবর্তন করে সেই কক্ষপথের শক্তি ধারণ করে। ইলেকট্রনের ক্ষপথগুলোর

শক্তিকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট শক্তি স্ড়র হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এই স্ড়রগুলোকে ইলেকট্রনের শক্তি স্ড়র বলে।
শক্তি ব্যান্ড : কোনো কঠিন পদার্থের কেলাসে বিভিন্ন পরমাণুতে একই কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তি যে সীমা বা পালণ্ডার মধ্যে অবস্থান করে তাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।
যোজন ব্যান্ড : পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে অবস্থিত ইলেকট্রনকে যোজন ইলেকট্রন বলে। কঠিন বস্তুতে পরমাণুর যোজন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পালণ্ডা বা ব্যান্ডকে যোজন ব্যান্ড বলে।
পরিবহন ব্যান্ড: পরমাণুতে অবস্থিত মুক্ত যোজন ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহনে অংশ গ্রহণ করে বলে এদেরকে পরিবহন ইলেকট্রন বলে। পরিবহন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে পরিবহন ব্যান্ড বলে।
নিষিদ্ধ শক্তি ব্যান্ড : সাধারণত যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে ইলেকট্রনের কোনো শক্তি স্ড়র বিদ্যমান থাকে না। এজন্য এ স্থানকে নিষিদ্ধ ব্যান্ড (Forbidden band) বলে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :
সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন
১। অর্ধপরিবাহীর যোজন ব্যান্ড ও পরিবাহন ব্যান্ডের মধ্যে শক্তির পার্থক্য প্রায় –
(ক)1 eV (খ) 15 eV (গ) 25 eV (ঘ) 50 eV
২। নিচের কোনটি সত্য?
(ক) পরিবাহীর পারিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকে (খ) অপরিবাহীর পরিবহন ব্যান্ড পূর্ণ থাকে
(গ) অর্ধপরিবাহীর পরিবহন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে
(ঘ) অর্ধ পরিবাহীর যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে উপরিপাতন ঘটে

পাঠ-১০.৩ : আধান বাহক : ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা
Charge Carrier: Concept of Electron & Hole

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-
- আধান বাহক হিসেবে ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.৩.১ আধান বাহক : ইলেকট্রন ও হোলের ধারণা
Charge carricr : Concept of electron and hole

ইলেকট্রন : আমরা জানি, সকল পদার্থই অতি ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তন করে। ইলেকট্রনিক্সে অত্যন্ড় ক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাই ইলেকট্রন সম্পর্কে ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, ইলেকট্রন হলো ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা এবং এর ভর নগন্য। ইলেকট্রনের কিছু গুর"ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো :

(ক) ইলেকট্রনের আধান, $e = 1.602\times10^{-19}$ C;

(খ) ইলেকট্রনের ভর, $m = 9.0\times10^{-31}$ kg;

(গ) ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ, $r = 1.9\times10^{-15}$ m এবং

(ঘ) ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান, $\frac{e}{m} = 1.77\times10^{11}\ \text{C kg}^{-1}$ ।

ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধানের মান থেকে দেখা যায় যে, ইলেকট্রনের আধানের তুলনায় এর ভর খুবই কম। ইলেকট্রনের এ ধর্মের কারণে এর গতিশীলতা অনেক বেশি এবং এটি তড়িৎক্ষেত্র অথবা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের মধ্যে দুধরনের শক্তি বিদ্যমান থাকে। এর গতির জন্য থাকে গতিশক্তি এবং নিউক্লিয়াসের আধানের জন্য থাকে বিভবশক্তি। ইলেকট্রনের মোট শক্তি এর গতিশক্তি ও বিভবশক্তির যোগফলের সমান।

মুক্ত ইলেকট্রন : কোনো কোনো পদার্থে, বিশেষ করে ধাতব পদার্থে যোজন ইলেকট্রনগুলির শক্তি এত বেশি থাকে যে, এগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে খুব হালকাভাবে আবদ্ধ থাকে। হালকাভাবে আবদ্ধ এই যোজন ইলেকট্রনগুলো পদার্থের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। এগুলোকে মুক্ত ইলেকট্রন বলে। যোজন ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে যেগুলো অত্যন্ড় হালকাভাবে নিউক্লিয়াসের সাথে আবদ্ধ থাকে সেগুলোকে মুক্ত ইলেকট্রন বলে।

বাইরে থেকে সামান্য পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা হলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো সহজেই চলাচল করতে পারে। এই মুক্ত ইলেকট্রন গুলোই কোনো পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্ম নির্ধারণ করে। পরিবাহীতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় অন্ড়রক পদার্থে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। অর্ধ পরিবাহীতে কক্ষ তাপমাত্রায় খুবই স্বল্প সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে।

হোল (Hole) : জার্মেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি অর্ধপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে 4 টি যোজন ইলেকট্রন থাকার ফলে এগুলো প্রতিবেশী পরমাণুর ইলেকট্রনের সাথে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে বাইরের কক্ষপথে অষ্টক পূর্ণ করে অর্থাৎ সমযোজী বন্ধন (Covalent Band) গঠন করে। ফলশ্র"তিতে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম বা সিলিকনে কোনো স্বাধীন বা মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। তাই নিম্ন তাপমাত্রায় তাদের কোনো পরিবহন ক্ষমতা থাকে না।

কক্ষ তাপমাত্রায় বা একটু বেশি তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর কিছু সংখ্যক সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়। বিভব পার্থক্য বা তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। একই সময়ে অন্য একটি প্রবাহ যাকে হোল প্রবাহ বলে, ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে সৃষ্টি হয়।

তাপীয় শক্তির জন্য ইলেকট্রন যখন কোনো সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে বের হয়ে আসে তখন ইলেকট্রনের এই অপসারণ সমযোজী বন্ধনে একটি শূন্য স্থান রেখে আসে। ইলেকট্রনের এই শূন্যতা বা অনুপস্থিতিকে হোল বলা হয়, যেটি ধনাত্মক আধান হিসেবে কাজ করে।

একটি হোলের চার্জ 1.6×10^{-19} C। যখনই একটি ইলেকট্রন মুক্ত হয়, তখনই একটি হোলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাপীয় শক্তি হোল-ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি করে। যতগুলো মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি হয় ততগুলোই হোলের সৃষ্টি হয়। হোল কীভাবে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে তা [চিত্র ১০. ৬] এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো। হোল হলো একটি ইলেকট্রনের অনুপস্থিতি।

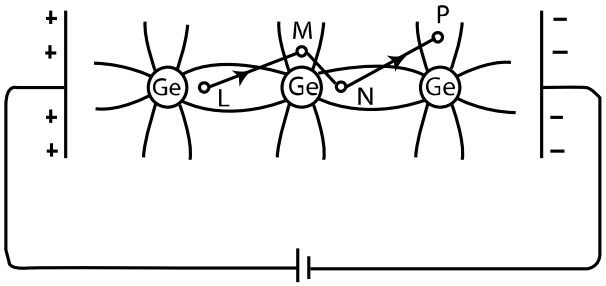

চিত্র ১০.৬

ধরা যাক, L বিন্দুতে অবস্থিত যোজন ইলেকট্রন তাপীয় শক্তির প্রভাবে মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হলো। এর ফলে সমযোজী বন্ধনের L বিন্দুতে একটি হোলের সৃষ্টি হলো। এই হোল ইলেকট্রনের জন্য একটি শক্তিশালী আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে নিকটবর্তী সমযোজী বন্ধন থেকে একটি যোজন ইলেকট্রন (ধরা যাক, M বিন্দুর) L বিন্দুস্থ হোলকে পূর্ণ করার জন্য চলে আসে। এর ফলে M বিন্দুতে একটি হোলের উদ্ভব হয়। অন্য একটি যোজন ইলেকট্রন (N বিন্দুর) এর বন্ধন থেকে বের হয়ে এসে M বিন্দুতে অবস্থিত হোলকে পূর্ণ করবে এবং N বিন্দুতে একটি হোলের সৃষ্টি করবে। সুতরাং ধনাত্মক আধানযুক্ত হোল যখন L থেকে N এর দিকে যায় অর্থাৎ তড়িৎ উৎসের ঋণাত্মক প্রান্ড়ের দিকে যায়, তখনই হোল তড়িৎ

প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে হোল প্রবাহের সৃষ্টি হয় এক সমযোজী বন্ধন থেকে অন্য সমযোজী বন্ধনে যোজন ইলেকট্রনের গতির ফলে।

হোল প্রবাহের শক্তি ব্যান্ড বর্ণনা ঃ শক্তি ব্যান্ডের সাহায্যে হোল তড়িৎ প্রবাহকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক তাপীয় শক্তির দ্বারা একটি যোজন ইলেকট্রন যোজন ব্যান্ড হতে পরিবহন ব্যান্ডে গমন করে। ফলে যোজন ব্যান্ডে একটি শূন্যতা বা হোলের সৃষ্টি হয় (L বিন্দুতে)। এখন M বিন্দুর যোজন ইলেকট্রন L বিন্দুর হোলকে পূর্ণ করার জন্য চলে আসে। ফলে L বিন্দুস্থ হোল বিলুপ্ত হয় এবং M বিন্দুতে হোলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে N বিন্দুর যোজন ইলেকট্রন M বিন্দুর হোলকে পূর্ণ করার জন্য M বিন্দুতে আসে। ফলশ্রুতিতে N বিন্দুতে হোলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং যোজন ইলেকট্রন PNML পথ বরাবর গতিশীল হয়, যেখানে হোল এর বিপরীত দিকে অর্থাৎ LMNP পথ বরাবর গতিশীল হয়।

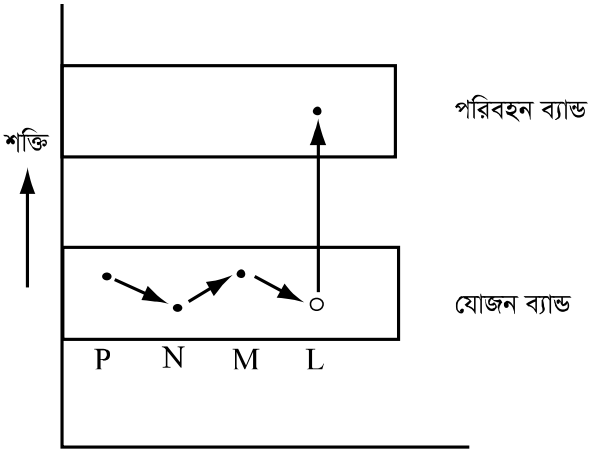

চিত্র : ১০.৭

সার-সংক্ষেপ :

পরমাণু : সকল পদার্থই অতি ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। এদেরকে পরমাণু বলে।

মুক্ত ইলেকট্রন : কোনো কোনো পদার্থে, বিশেষ করে ধাতব পদার্থে যোজন ইলেকট্রনগুলির শক্তি এত বেশি থাকে যে, এগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে খুব হালকাভাবে আবদ্ধ থাকে। হালকাভাবে আবদ্ধ এই যোজন ইলেকট্রনগুলো পদার্থের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। এগুলোকে মুক্ত ইলেকট্রন বলে।

হোল : তাপীয় শক্তির জন্য ইলেকট্রন যখন কোনো সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে বের হয়ে আসে তখন ইলেকট্রনের এই অপসারণ সমযোজী বন্ধনে একটি শূন্য স্থান রেখে আসে। ইলেকট্রনের এই শূন্যতা বা অনুপস্থিতিকে হোল বলা হয়, যেটি ধনাত্মক আধান হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। একটি অর্ধ পরিবাহী পদার্থে তড়িৎ পরিবাহিতার জন্য দায়ী কোনটি?

(ক) হোল
(খ) মুক্ত ইলেকট্রন
(গ) মুক্ত ইলেকট্রন ও হোল
(গ) মুক্ত ইলেকট্রন ও প্রোটন

২। একটি বিশুদ্ধজাত অর্ধপরিবাহীতে কক্ষ তাপমাত্রায় কিছু হোল আছে। হোল সৃষ্টির কারণ-

(ক) ডোপিং
(খ) মুক্ত ইলেকট্রন
(গ) তাপীয় শক্তি

(ঘ) যোজন ইলেকট্রন

পাঠ-১০.৪ : অর্ধপরিবাহী প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি –

- অন্ড়র্জাত ও বহির্জাত অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- *p*- টাইপ ও *n*- টাইপ অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৪.১ অন্ড়র্জাত ও বহির্জাত অর্ধপরিবাহী

Intrinsic and Extrinsic Semiconductor

অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর পদার্থকে দুভাবে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো –

১। বিশুদ্ধ বা অন্ড়র্জাত অর্ধপরিবাহী (Pure or Intrinsic Semiconducter)

২। অবিশুদ্ধ বা বহির্জাত পরিবাহী (Impure or Extrinsic Semiconducter)

১। বিশুদ্ধ বা অন্ড়র্জাত অর্ধপরিবাহী ঃ যে সব অর্ধপরিবাহীতে কোনো অপদ্রব্য (Impurity) থাকে বা মেশানো হয় না তাদেরকে বিশুদ্ধ বা অন্ড়র্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

উদাহরণঃ যে সব পদার্থের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে সর্বোচ্চ 8টি ইলেকট্রনের স্থানে 4টি যোজন ইলেকট্রন বিদ্যামান থাকে এবং যেগুলো পর্যায় সারণির চতুর্থ গ্রুপের সদস্য সেগুলো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর অন্ড়র্ভূক্ত। যেমন –সিলিকন, জার্মেনিয়াম, টিন ইত্যাদি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী। বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে কক্ষ তাপমাত্রায় হোল-ইলেকট্রন জোড়ের সৃষ্টি হয়। ফলে এদের পরিবহন ব্যান্ডের ইলেকট্রন সংখ্যা এবং যোজন ব্যান্ডের হোলের সংখ্যা সমান হয়। বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রনের এবং হোলের সংখ্যা খুব কম হওয়াতে এদের তড়িৎ পরিবাহিতা খুব কম হয় এবং বাস্ড়বে কোনো কাজে লাগানো যায় না।

২। অবিশুদ্ধ বা বহির্জাত পরিবাহী ঃ বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে খুব সামান্য পরিমাণে (এক কোটি পরমাণুতে একটি পরমাণু) যথোপযুক্ত অপদ্রব্য মেশালে যে অর্ধপরিবাহীর সৃষ্টি হয় তাকে অবিশুদ্ধ বা দূষিত বা বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে অপদ্রব্য মেশানোর ফলে এগুলোতে বিপুল পরিমাণ মুক্ত ইলেকট্রন বা মুক্ত হোলের সৃষ্টি হয়, ফলে সিলিকন বা জার্মেনিয়াম কেলাসের পরিবাহিতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়। অপদ্রব্যযুক্ত এই অর্ধপরিবাহীকে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম, সিলিকন অর্ধপরিবাহীর সাথে বোরন, এ্যালুমিনিয়াম, ফসফরাস, আর্সেনিক ইত্যাদি অপদ্রব্য মিশিয়ে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী তৈরি করা হয়।

ডোপিং (Doping) ঃ বহির্জাত অর্ধপরিবাহী তৈরির জন্য বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত উপায়ে সামান্য পরিমাণ অপদ্রব্য মিশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

ডোপিং এর ফলে অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ডোপিং এর জন্য দুই ধরনের অপদ্রব্য ব্যবহার করা হয়। যথা –

(ক) পর্যায় সারণির তৃতীয় সারির মৌল, যেমন –বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম ইত্যাদি।

(খ) পর্যায় সারণির পঞ্চম সারির মৌল, যেমন – ফসফরাস, আর্সেনিক, এন্টিমনি ইত্যাদি।

১০.৪.২ *p* - টাইপ এবং *n*- টাইপ অর্ধপরিবাহী

***p*- type and *n*- type semiconducter**

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে কোনো ধরনের অপদ্রব্য মিশানো হয় তার উপর ভিত্তি করে বহির্জাত অর্ধপরিবাহীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১। p- টাইপ অর্ধপরিবাহী।

২। n-টাইপ অর্ধপরিবাহী।

১। p- টাইপ অর্ধপরিবাহী ঃ কোনো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সামান্য পরিমাণ ত্রিযোজী মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে p- টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে অপদ্রব্যকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উচ্চতাপে মেশানো হয়। অপদ্রব্যের পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেন এর পরমাণুগুলো মূল অর্ধপরিবাহী কেলাসের গঠন কাঠামোর কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেলাস ল্যাটিসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আমরা জানি, জার্মেনিয়াম বা সিলিকনের পরমাণুতে চারটি করে যোজন ইলেকট্রন রয়েছে। অপরদিকে অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুতে তিনটি যোজন ইলেকট্রন আছে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের সাথে যদি উপযুক্ত মাত্রায় (দশ লক্ষে একটি) অ্যালুমিনিয়ামের মতো ত্রিযোজী মৌল মেশানো হয়, তা হলো ঐ কেলাসের গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পার্শ্ববর্তী চতুর্যোজী অর্ধপরিবাহীর সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করতে এর একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি পড়ে। ফলে ঐ স্থানে বন্ধন তৈরি হয় না। এই

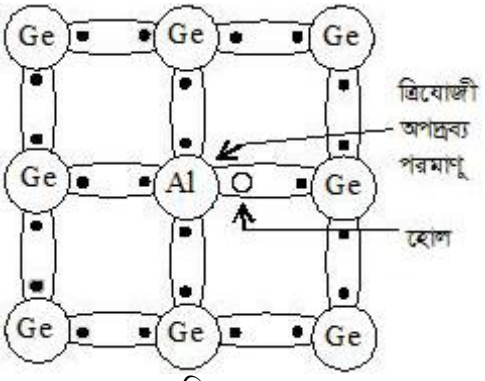

চিত্র : ১০.৮

ইলেকট্রন ঘাটতি মানেই 'হোল' সৃষ্টি হয়। প্রতিটি Al পরমাণু একটি করে হোল সৃষ্টি করে [চিত্র : ১০.৮]। এ হোলগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। এ জন্য অ্যালুমিনিয়াম পরমানুকে 'গ্রাহক' পরমাণু বলে। এভাবে প্রতিটি অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু একটি করে হোল সৃষ্টি করে। এভাবে খুব সামান্য পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম লক্ষ লক্ষ হোল সৃষ্টি করে। অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর ধনাত্মক হোল Ge - Ge বন্ধন থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে যে পরমাণু থেকে এটি আসে সেখানে একটি হোলের সৃষ্টি হয়। সেই হোলকে পূর্ণ করার জন্য অন্য একটি ইলেকট্রন চলে আসে। এভাবে এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। ফলে মনে হয়, ধনাত্মক হোল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের গতির বিপরীত দিকে গতিশীল হয়। এছাড়া কক্ষ তাপমাত্রায় তাপীয় শক্তির প্রভাবে কিছু সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং পরিবহন ব্যান্ডে খুব সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকে। এখানে গরিষ্ঠ আধান বাহক হলো হোল এবং লঘিষ্ঠ আধান বাহক হলো ইলেকট্রন। এখানে হোল অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জের গতির ফলেই তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এ ধরনের অর্ধপরিবাহীকে p- টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

২। n-টাইপ অর্ধপরিবাহী : কোনো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সামান্য পরিমাণ পঞ্চযোজী মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে তাকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

কিভাবে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী তৈরি করা হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের কেলাস বিবেচনা করি। আমরা জানি জ্যার্মেনিয়ামে পরমাণুতে চারটি যোজন ইলেকট্রন থাকে। অপরদিকে অপদ্রব্য পরমাণু আর্সেনিকের পাঁচটি যোজন ইলেকট্রন আছে। বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের সাথে যদি উপযুক্ত মাত্রায় (দশ লক্ষে একটি) আর্সেনিকের মতো কোনো পঞ্চযোজী মৌল মেশানো হয়, তাহলে ঐ কেলাসের গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু মিশ্রিত পরমাণুর পাঁচটি যোজন ইলেকট্রনের মধ্যে চারটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধন গঠন করে এবং একটি ইলেকট্রন উদ্বৃত্ত থাকে [চিত্র ১০. ৯]।

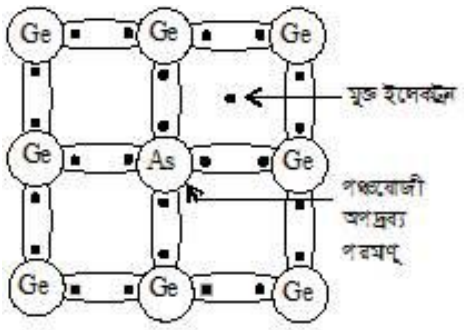

চিত্র ১০.৯

এই উদ্বৃত্ত ইলেকট্রনকে খুব সামান্য শক্তি সরবরাহ করে মুক্ত করা যায় এবং এগুলোই অর্ধপরিবাহীর তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি করে। প্রতিটি অপদ্রব্য পরমাণু (AS) কেলাসে একটি করে ইলেকট্রন দান করে। তড়িৎ পরিবহনের জন্য অপদ্রব্য পরমাণুগুলো ইলেকট্রন দান করে বলে এদেরকে 'দাতা' পরমাণু বলে। এভাবে খুব সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক অপদ্রব্য লক্ষ

লক্ষ মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি করে। এ ধরনের অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন অর্থাৎ ঋণাত্মক চার্জের গতির ফলেই প্রধানত তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় বলে এদেরকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

এছাড়া কক্ষ তাপমাত্রায় তাপীয় শক্তির প্রভাবে খুব সামান্য পরিমাণ হোল-ইলেকট্রন জোড়া সৃষ্টি হয়। তথাপি পঞ্চযোজী মৌল কর্তৃক সরবরাহকৃত মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা সৃষ্ট হোলের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এ কারণে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে গরিষ্ঠ আধান বাহক হলো ইলেকট্রন এবং লঘিষ্ঠ আধান বাহক হলো হোল।

সার-সংক্ষেপ :

অন্ড়র্জাত অর্ধপরিবাহী ঃ যে সব অর্ধপরিবাহীতে কোনো অপদ্রব্য থাকে না মেশানো হয় না তাদেরকে বিশুদ্ধ বা অন্ড়র্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

বহির্জাত পরিবাহী ঃ বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে খুব সামান্য পরিমাণে (এক কোটি পরমাণুতে একটি পরমাণু) যথোপযুক্ত অপদ্রব্য মেশালে যে অর্ধপরিবাহীর সৃষ্টি হয় তাকে অবিশুদ্ধ বা দূষিত বা বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

ডোপিং ঃ বহির্জাত অর্ধপরিবাহী তৈরির জন্য বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত উপায়ে সামান্য পরিমাণ অপদ্রব্য মিশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

***p*- টাইপ অর্ধপরিবাহী ঃ** কোনো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সামান্য পরিমাণ ত্রিযোজী মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে, তাকে p- টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

***n*-টাইপ অর্ধপরিবাহী :** কোনো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সামান্য পরিমাণ পঞ্চযোজী মৌল অপদ্রব্য হিসেবে মেশানো হলে তাকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। p-টাইপ জার্মেনিয়াম অর্ধপরিবাহী তৈরির জন্য নিচের কোনটি দিয়ে ডোপিং করতে হবে?

(ক) আর্সেনিক
(খ) এন্টিমনি
(গ) অ্যালুমিনিয়াম
(ঘ) ফসফরাস

২। যখন বিশুদ্ধ সিলিকন অর্ধপরিবাহীতে অপদ্রব্য হিসেবে আর্সেনিক ডোপিং করা হয় তখন যা তৈরি হবে–

(ক) n-টাইপ অর্ধপরিবাহী
(খ) p-টাইপ অর্ধপরিবাহী
(গ) n-টাইপ পরিবাহী
(ঘ) কোনটিই না

পাঠ-১০.৫ : ডায়োড : *p–n* জাংশনের বৈশিষ্ট্য লেখ

Diode : Characteristic Curve of a *p–n* Junction

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি-

- অর্ধপরিবাহী ডায়োড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- *p-n* জাংশনের বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অংকন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

১০.৫.১ অর্ধপরিবাহী ডায়োড বা জাংশন ডায়োড

Semiconductor Diode or Junction Diode

জাংশান ডায়োড : একটি *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহী ও একটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হলে সংযোগ পৃষ্ঠকে তথা সৃষ্ট ব্যবস্থাকে *p-n* জাংশন বা জাংশন ডায়োড বলে। দুটি অর্ধপরিবাহী সমন্বয়ে গঠিত বলে একে অর্ধপরিবাহী ডায়োডও বলে [চিত্র ১০.১০ (ক)]।

প্রকৃতপক্ষে দুটি অর্ধপরিবাহীকে জোড়া লাগিয়ে ডায়োড তৈরি করা হয় না। বাস্ড়বে একটি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কেলাসের এক অর্ধাংশে ত্রিযোজী অপদ্রব্য এবং অপর অর্ধাংশে পঞ্চযোজী অপদ্রব্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে *p-n* জাংশন তৈরি করা হয়।

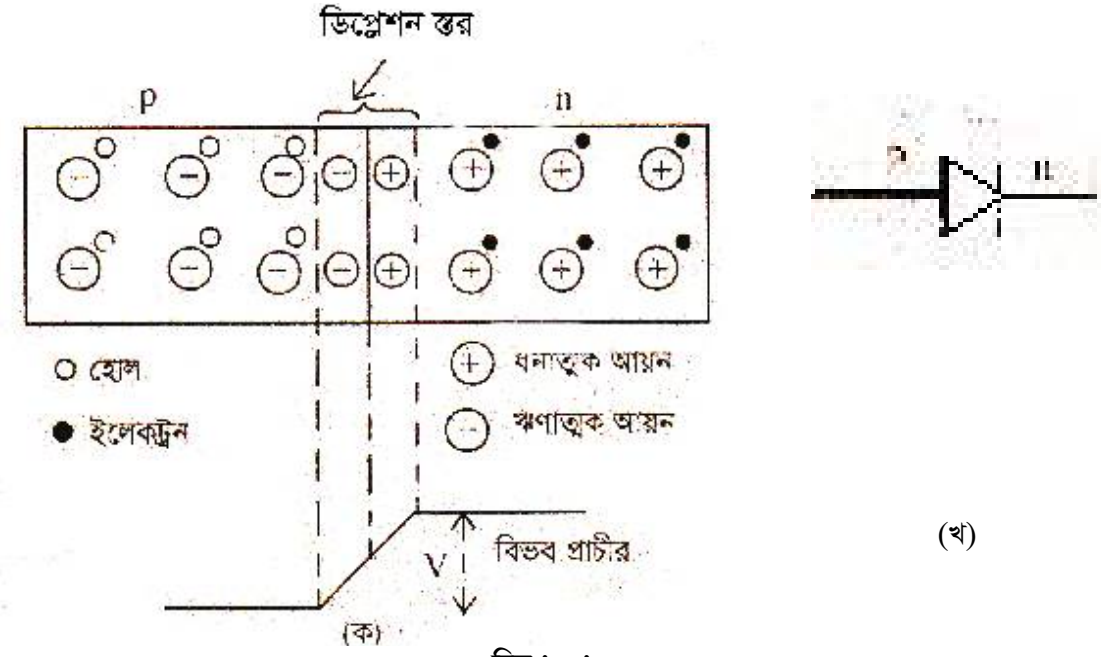

চিত্র ১০.১০

আমরা জানি, একটি *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর অভ্যন্ড়রে বহুসংখ্যক হোল ও অতি অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। একইভাবে একটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে বহুসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন এবং অতি অল্পসংখ্যক হোল বর্তমান থাকে। *p-n* জাংশন তৈরির সাথে সাথে *p*-অঞ্চলের হোলের সংখ্যা *n*-অঞ্চলের হোলের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বলে ব্যাপনের নিয়ম অনুযায়ী *p*-অঞ্চলের হোলগুলো *n*-অঞ্চলে যেতে চেষ্টা করে যাতে *p* ও *n* অঞ্চলের সর্বত্র হোলের ঘনত্ব সমান হয়। অনুরূপভাবে *n*-অঞ্চল থেকে কিছু ইলেকট্রন *p*-অঞ্চলে যেতে চেষ্টা করে।

অর্থাৎ ডায়োডের জাংশনে মুক্ত হোল এবং মুক্ত ইলেকট্রন উভয়েই ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে সংযোগস্থলকে অতিক্রম করতে চায়।

যখন p-অঞ্চল হতে কিছুসংখ্যক হোল n-অঞ্চলে প্রবেশ করে মুক্ত ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হয়ে তড়িৎ নিরপেক্ষ হয়, তখন n-অঞ্চলে সমসংখ্যক ধনাত্বক দাতা আয়ন উন্মুক্ত হয়। আবার n-অঞ্চল হতে একই প্রক্রিয়ায় মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যখন p-অঞ্চলে প্রবেশ করে হোলের সাথে মিলিত হয়ে তড়িৎ নিরপেক্ষ হয় তখন p-অঞ্চলে সমসংখ্যক ঋণাত্মক গ্রাহক আয়ন উন্মুক্ত হয়। ফলে জাংশনের সন্নিকটে p-অঞ্চলে কিছু ঋণাত্মক আয়ন এবং n-অঞ্চলে কিছু ধনাত্মক আয়নের উদ্ভব ঘটে [চিত্র ১০.১০ক]। এভাবে যখন যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক ও দাতা আয়ন উন্মুক্ত হয়, তখন ব্যাপন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ড় হবে। এখন n-অঞ্চলের ধনাত্মক আধান p-অঞ্চল থেকে হোলের আগমন এবং p-অঞ্চলের ঋণাত্মক আধান n-অঞ্চল থেকে ইলেকট্রনের আগমনকে বাঁধা দেবে। ফলে সংযোগস্থলে একটি বিভব প্রাচীর গড়ে ওঠে যা বিভব বাঁধা V_0 এর সৃষ্টি করবে। এই বিভব বাঁধার পরিমাণ 0.1 - 0.3 V হয়ে থাকে। এই বিভব বাঁধার বাইরে জাংশানের উভয় পাশে কেলাস তড়িৎ নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে।

p-n জাংশনের বিভব বাঁধা অংশে n-অঞ্চলে ধনাত্মক আয়ন এবং p-অঞ্চলে ঋণাত্মক আয়ন উন্মুক্ত হয়। এ অঞ্চলে কোনো মুক্ত আধান বাহক থাকে না। এ অংশকে নিঃশেষিত স্ড়র বা ডিপেণ্ডশন স্ড়র (Depletion layer) বলে। **১০.১০ (খ)** চিত্রে p-n জাংশন ডায়োডের প্রতীক দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্ন দ্বারা p-অঞ্চলে তথা প্রচলিত প্রবাহের দিক এবং তীরটির সামনের উলণ্টম্ব রেখা দ্বারা n-অঞ্চল বোঝানো হয়।

অর্ধপরিবাহী ডায়োডের বায়াসিং
Biasing of Semiconductor Diode

একটি ***p-n*** জাংশনে বাহ্যিক ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এটি নির্ভর করে ***p-n*** জাংশনে বিভব পার্থক্য কীভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার ওপর। একটি ***p-n*** জাংশনকে দুই ভাবে বায়াসিং বা ঝোঁক প্রদান করা যায়। এগুলো হলো–

১। সম্মুখী ঝোঁক (Forward Bias)

২। বিমুখী ঝোঁক (Reverse Bias)

১। সম্মুখী ঝোঁক ঃ যখন ***p-n*** জাংশনে বহিঃস্থ ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যার ফলে এটি বিভব প্রাচীরকে হ্রাস করে বা নিষ্ক্রিয় করে তড়িৎপ্রবাহ চালু করে তখন একে সম্মুখী ঝোঁক বলা হয়।

বহিঃস্থ ভোল্টেজ যদি ***p-n*** জাংশনে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, কোষের ধনাত্মক প্রান্ড় ***p***-টাইপ অর্ধপরিবাহীর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ড় ***n***-টাইপ অর্ধপরিবাহী সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তাকে সম্মুখী ঝোঁক বলে [চিত্র ১০.১১]।

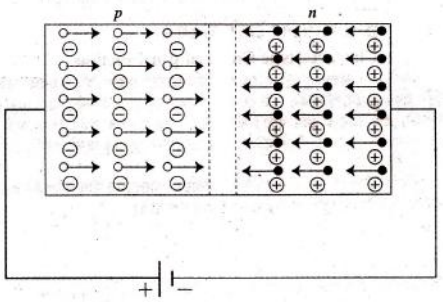

চিত্র ১০.১১

এক্ষেত্রে কোষের ধনাত্মক প্রান্ড় ***p***-অঞ্চলের হোলগুলোকে বিকর্ষণ করে জাংশনের দিকে এবং ঋণাত্মক প্রান্ড় ***n***- অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলোকে বিকর্ষণ করে সংযোগের দিকে পাঠাবে। জাংশনে সম্মুখী ঝোঁক প্রয়োগ করার ফলে সৃষ্ট তড়িৎক্ষেত্র বিভব প্রাচীরের জন্য যে তড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তার বিপরীতে ক্রিয়া করে। ফলে লব্ধি তড়িৎক্ষেত্রের মান কমে যায় এবং বিভব প্রাচীরের উচ্চতা হ্রাস পায়। ফলে ***n***-অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন ***p***-অঞ্চলে এবং ***p***-অঞ্চল থেকে হোল ***n***-অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। যেহেতু বিভব প্রাচীর এর ভোল্টেজ খুব কম (0.1-0.3 V) , যেহেতু সামান্য সম্মুখী ভোল্টেজ প্রয়োগ করলেই বিভব প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। যখন সম্মুখী ঝোঁক দ্বারা বিভব প্রাচীর অপসারিত হয়, জাংশনের রোধ তখন শূন্যে নেমে আসে। তখন ***p-n*** জাংশানে ও বহিঃস্থ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্ঠি হয়। এই প্রবাহকে সম্মুখী প্রবাহ বলে। আর এই ধরনের সংযোগকে বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক।

২। বিমুখী ঝোঁক : যখন *p-n* জাংশনে বহিঃস্থ ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে বিভব প্রাচীর-এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তখন একে বিমুখী ঝোঁক বলা হয়।

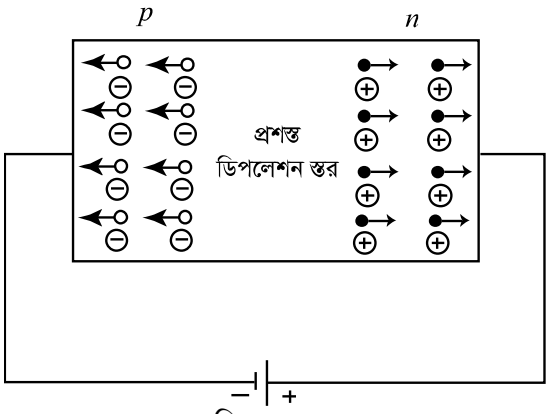

চিত্র ১০.১২

বহিঃস্থ ভোল্টেজ যদি *p-n* জাংশনে বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ কোষের ধনাত্মক প্রান্ড় যদি n-টাইপ এবং ঋণাত্মক প্রান্ড় যদি *p*-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তাকে বিমুখী ঝোঁক বলে [চিত্র ১০. ১২]। এক্ষেত্রে কোষের ধনাত্মক প্রান্ড়ের আকর্ষনের ফলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো *n*-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে। জাংশন পার হয়ে কিছুতেই *p*-টাইপ বস্তুতে যেতে পারবে না। আবার *p*-টাইপ বস্তুর হোলগুলো কোষের ঋণাত্মক প্রান্ড়ের আকর্ষণের ফলে *p*-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে। ফলে বিভব প্রাচীর তথা ডিপেণ্ডশন স্ড়রের প্রশস্ড়তা বৃদ্ধি পাবে। ফলে, *n*-অঞ্চলের ইলেকট্রন এবং *p*-অঞ্চলের হোলগুলো বিভব প্রাচীর অতিক্রম করে বিপরীত অঞ্চলে যেতে পারে না। এজন্য বর্তনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আধান বাহকের জন্য কোনো তড়িৎ প্রবাহ থাকে না। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় বিমুখী ঝোঁক।

একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, তাপীয় উত্তেজনার ফলে *p*-টাইপ এবং *n*-টাইপ বস্তুতে খুব স্বল্প সংখ্যক হোল-ইলেকট্রন জোড়ের সৃষ্টি হয়। ফলে সংখ্যা লঘিষ্ঠ আধান বাহকের জন্য খুব অল্পমানের (কয়েক μA মানের) প্রবাহ বর্তনীতে প্রবাহিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, *p-n* জাংশনে সম্মুখী ঝোঁকের বেলায় তড়িৎ প্রবাহ থাকে। কিন্তু বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহ থাকে না। এজন্য *p-n* জাংশনকে তড়িৎ একমুখীকরণের জন্য বা রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১০.৫.২ p-n জাংশনের বৈশিষ্ট্য লেখ

Characteristic Curve of a p-n Junction

একটি *p-n* জাংশনের দুইপ্রান্ড়ে ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। ভোল্টেজ পরিবর্তনের সাথে এর তড়িৎপ্রবাহের যে পরিবর্তন ঘটে তা লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। *V* বনাম *I* লেখকে *p-n* জাংশনের বা অর্ধপরিবাহী ডায়োডের বৈশিষ্ট্য লেখ বা *I-V* লেখচিত্র বলা হয়।

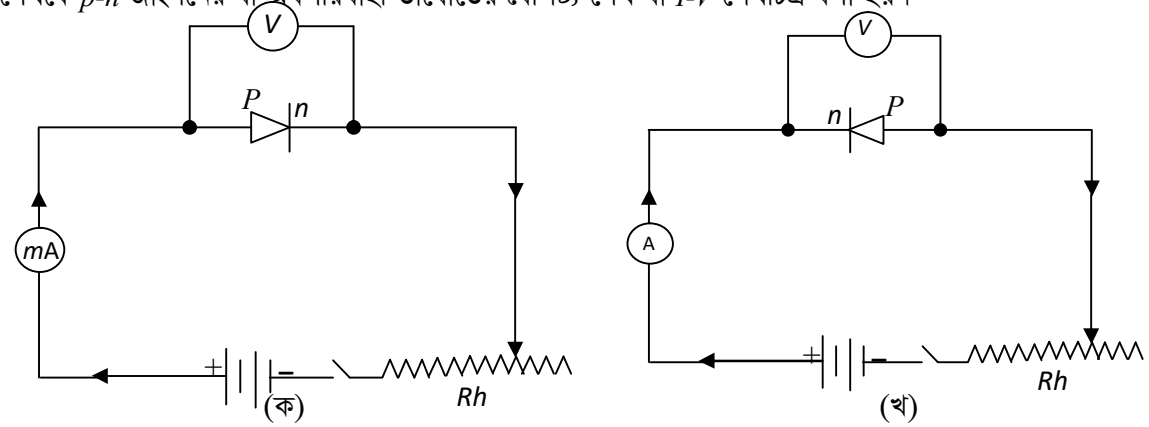

চিত্র : ১০.১৩

একটি *p-n* জাংশনের বৈশিষ্ট্য লেখ অঙ্কন করার জন্য সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে ১০.১৩ক চিত্রের ন্যায় একটি বর্তনী ব্যবহার করা হয়। বর্তনীতে রয়েছে একটি জাংশন ডায়োড, তড়িৎপ্রবাহ মাপার জন্য একটি মিলি আমিটার বিভব পার্থক্য মাপার জন্য একটি ভোল্টমিটার, একটি ব্যাটারি চাবি ইত্যাদি। পরিবর্তনশীল রোধ *Rh* এর মাধ্যমে জাংশনের দুই প্রান্তের বায়াসিং ভোল্টেজ এর মান হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। প্রযুক্ত ভোল্টেজ (*V*) কে *X*-অক্ষের দিকে এবং তড়িৎ প্রবাহমাত্রা (*I*) কে *Y*-অক্ষ বরাবর স্থাপন করলে চিত্র ১০.১৩(গ)-এর ন্যায় লেখচিত্র পাওয়া যাবে।

সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে : লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, সম্মুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ভোল্টেজের মান খুব কম হলে প্রবাহমাত্রার মান খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং লেখটি সরলরৈখিক নয়। এক্ষেত্রে বাহ্যিক যে ভোল্টেজ এ প্রয়োগ করা হয় তা জাংশনের বিভব প্রাচীর অতিক্রম করতে ব্যয়িত হয়। প্রযুক্ত ভোল্টেজের মান একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করার পর তড়িৎ প্রবাহ দ্রুত সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডায়োডের এই নিদিষ্ট ভোল্টেজকে প্রারম্ভিক বা সূচন ভোল্টেজ (Threshold Voltage) বা নী ভোল্টেজ বলে। সিলিকন ডায়োডের জন্য এই ভোল্টেজের মান 0.7V এবং জার্মেনিয়াম এর ক্ষেত্রে এই মান 0.3V। যখন বাহ্যিক প্রযুক্ত ভোল্টেজ বিভব প্রাচীরের ভোল্টেজকে অতিক্রম করে তখন p-n জাংশন একটি সাধারণ পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে।

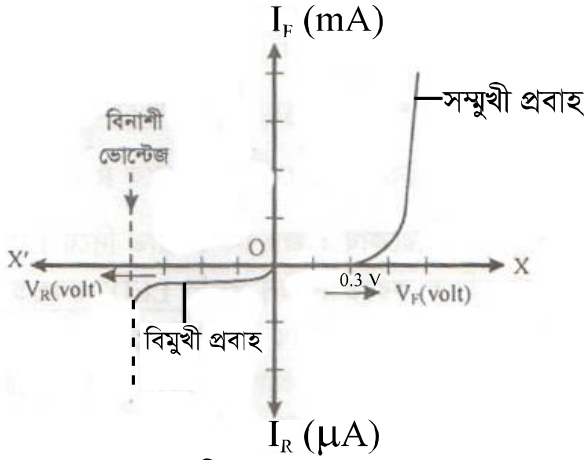

চিত্র : ১০.১৩(গ)

বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে : বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে *p-n* জাংশনের *p*-টাইপ এবং *n*-টাইপ বস্তুকে ব্যাটারির যথাক্রমে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক প্রান্তের সাথে চিত্র ১০.১৩(গ)-এর সংযুক্ত করা হয়। বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে জাংশনের বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে জাংশনের রোধ অনেক বেড়ে যায় এবং বাস্তবে বর্তনীতে কোনো প্রবাহ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে, বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রেও বর্তনীতে খুব অল্প মানের তড়িৎ (মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার ক্রমের) প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহকে বিমুখী প্রবাহ বলে। আমরা জানি *p*-টাইপ বস্তুতে খুব অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন এবং *n*-টাইপ বস্তুতে খুব অল্প সংখ্যক হোল থাকে। এই ইলেকট্রন এবং হোল উভয়ক্ষেত্রে লঘিষ্ঠ আধান বাহক হিসেবে কাজ করে। এদের জন্যই বিমুখী ঝোঁকে খুব অল্প মানের তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়, কেননা এই লঘিষ্ঠ আধান বাহকের জন্য বিমুখী ঝোঁাক সম্মুখী ঝোঁক -এর কাজ করে। বিমুখী ঝোঁকে প্রযুক্ত ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হলেও বিমুখী প্রবাহ দ্রুত সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে একটি সম্পৃক্ত মানে পৌঁছে। এই প্রবাহকে বিমুখী সম্পৃক্ত প্রবাহ (Reverse Saturation current) বা লিকেজ প্রবাহ (leakge current) বলে।

p-n জাংশনের বিমুখী ঝোঁকে যদি ভোল্টেজকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়, তখন এক সময় হঠাৎ করে বিপুল পরিমান তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায় (চিত্রের ভগ্নরেখা)। যেন মনে হয় *p-n* জাংশনের বিভব প্রাচীর বা রোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিমুখী ঝোঁকের যে উচ্চ ভোল্টেজের জন্য এমনটি ঘটে তাকে জেনার ভোল্টেজ বা জেনার বিভব বা বিনাশী ভোল্টেজ বলে। 1934 সালে বিজ্ঞানী জেনার কর্তৃক আবিস্কৃত ডায়োডের এ ক্রিয়াকে জেনার ক্রিয়া বলে।

গতীয় রোধ : (Dynamic Resistance)

একটি *p - n* জংশনে সম্মুখী ঝোঁক প্রয়োগ করা হলে, বিভব পার্থক্য সামান্য বৃদ্ধি করলে জংশনে তড়িৎ প্রবাহ অনেক বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন অনেক বেশি হয়। আবার বিমুখী ঝোঁক থাকা অবস্থায় বিভব পার্থক্যের অনেক বৃদ্ধির ফলেও প্রবাহমাত্রার পরিবর্তন খুব সামান্য হয়। সুতরাং সম্মুখী ঝোঁক প্রয়োগের সময় *p-n* জংশনের রোধ খুব কম হয়। এ রোধকে গতীয় রোধ বলে। গতীয় রোধের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া যায়।

কোনো *p- n* জংশনে প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের সামান্য পরিবর্তন ΔV এবং এর জন্য আনুষঙ্গিক তড়িৎ প্রবাহমাত্রার সামান্য পরিবর্তন ΔI এর অনুপাতকে গতীয় রোধ বা এসি রোধ বলে।

সুতরাং গতীয় রোধ,

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

এখানে, ΔV = জংশনে প্রযুক্ত বিভব পাথর্ক্যের ক্ষুদ্র পরিবর্তন

ΔI = জংশন প্রবাহের ক্ষুদ্র পরিবর্তন।

গাণিতিক উদাহরণ ১০.১ : একটি সিলিকনের তৈরি *p-n* জংশনের *V- I* লেখ হতে নিচের তথ্যগুলো পাওয়া গেল। সম্মুখী ঝোঁকে,

যখন $V = 0.7$ V, তখন I = 10 mA

যখন $V = 0.8$ V, তখন I = 20 mA

জংশনটির গতীয় রোধ কত?

আমরা জানি, গতীয় রোধ,

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

$$= \frac{0.1}{10 \times 10^{-3}}$$

$$= 10\ \Omega$$

$\therefore$ গতীয় রোধ, $R = 10\ \Omega$

এখানে,

বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন, $\Delta V = 0.8 - 0.7$

$= 0.1$ V

প্রবাহমাত্রার পরিবর্তন, $\Delta I = 20 - 10$

$= 10$ mA

$= 10 \times 10^{-3}$ A

গতীয় রোধ, $R = ?$

উ: $10\ \Omega$

সার-সংক্ষেপ :

জাংশান ডায়োড : একটি *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহী ও একটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হলে সংযোগ পৃষ্ঠকে তথা সৃষ্ট ব্যবস্থাকে *p-n* জাংশান বা জাংশান ডায়োড বলে। দুটি অর্ধপরিবাহী সমন্বয়ে গঠিত বলে একে অর্ধপরিবাহী ডায়োডও বলে।

সম্মুখী ঝোঁক ঃ যখন ***p-n*** জাংশনে বহিঃস্থ ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যার ফলে এটি বিভব প্রাচীরকে হ্রাস করে বা নিষ্ক্রিয় করে তড়িৎপ্রবাহ চালু করে তখন একে সম্মুখী ঝোঁক বলা হয়।

বিমুখী ঝোঁক : যখন *p-n* জাংশনে বহিঃস্থ ভোল্টেজ এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে বিভব প্রাচীর-এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তখন একে বিমুখী ঝোঁক বলা হয়।

নী ভোল্টেজ : প্রযুক্ত ভোল্টেজের মান একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করার পর তড়িৎ প্রবাহ দ্রুত সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডায়োডের এই নিদিষ্ট ভোল্টেজকে প্রারম্ভিক বা সূচন ভোল্টেজ (Threshold Voltage) বা নী ভোল্টেজ বলে।

গতীয় রোধ : কোনো *p- n* জংশনে প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের সামান্য পরিবর্তন ΔV এবং এর জন্য আনুষঙ্গিক তড়িৎ প্রবাহমাত্রার সামান্য পরিবর্তন ΔI এর অনুপাতকে গতীয় রোধ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। *p-n* জাংশনের সংযোগস্থলে ডিপেণ্ডশন স্ড়র সৃষ্টির কারণ–

(ক) আধান বাহকের ব্যাপন (খ) ইলেকট্রনের তাড়ন (Drift)

(গ) হোলের তাড়ন (ঘ) অপদ্রব্য আয়নের স্থানস্ড়র

২। সিলিকন ডায়োডের ক্ষেত্রে নী (Knee) ভোল্টেজ হলো–

(ক) 0.2 V (খ) 0.7 V (গ) 0.8 V (ঘ) 1.0 V

পাঠ-১০.৬ : একমুখীকরণ : পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ার
Rectification : Full Wave Bridge Rectifier

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- একমুখিকরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্ধতরঙ্গ রেকটিফিকেশন বর্তনী ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার বর্তনী ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার বর্তনী ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৬.১ : একমুখীকরণ
Rectification

তড়িৎশক্তি সাধারণত এসি (AC) সরবরাহ হিসেবে উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোল্টেজ সাইন তরঙ্গ আকারে পরিবর্তিত হয়। আমাদের দেশে সরবরাহকৃত পরিবর্তী ভোল্টেজের কম্পাংক 50 Hz। পরিবর্তী এই ভোল্টেজ ব্যবহার করা হয় আলোকশক্তি, তাপশক্তি উৎপাদনে এবং তড়িৎ মোটর ইত্যাদিতে। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজে ডিসি (DC) সরবরাহের অসংখ্য প্রয়োগ রয়েছে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা বর্তনী পরিচালনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন একমুখী প্রবাহ বা ডিসি প্রবাহ (Direct Current) প্রয়োজন হয়।

ব্যাটারি বা শুষ্ক কোষ হলো ডিসি প্রবাহের প্রধান উৎস। কিন্তু এদের ভোল্টেজ বেশ কম এবং এগুলো প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয় বলে বেশ ব্যয়বহুল। অর্থাৎ ব্যাটারি দ্বারা আমাদের সব প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের দিক পরিবর্তী তথা এসি ভোল্টেজকে একমুখী তথা ডিসি ভোল্টেজ রূপান্ড়রিত করা। যে প্রক্রিয়ায় এই রূপান্ড়রের কাজটি সম্পন্ন করা হয় তাকে বলে রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণ।

যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating current) বা ভোল্টেজকে একমুখী প্রবাহ (Direct current- ডিসি) বা ভোল্টেজে রূপান্ড়র করা হয় তাকে রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণ বলে। একমুখীকরণের কাজটি যে যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয় তাকে রেফটিফায়ার বলে।

জাংশন ডায়োডের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ডায়োড যখন সম্মুখী ঝোঁকে থাকে তখন এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং যখন এটি বিমুখী ঝোঁকে থাকে তখন এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। জাংশন ডায়োডের এ বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণের কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

একমুখীকরণে দুই ধরনের রেফটিফায়ার বর্তনী ব্যবহার করা হয়। যথা ঃ
(১) অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার।
(২) পূর্নতরঙ্গ রেকটিফায়ায়।

১০.৬.২ অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার
Half Wave Rectifier

মূলনীতি : একটি p-n জাংশন যখন সম্মুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয় তখন এর রোধ খুব কম হয়, আবার p-n জাংশন যখন বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয় তখন এর রোধ খুব বেশি হয়। এ নীতির উপর ভিত্তি করে একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার কাজ করে।

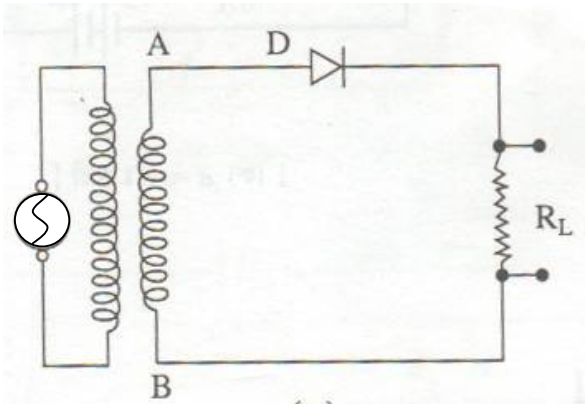

(ক)

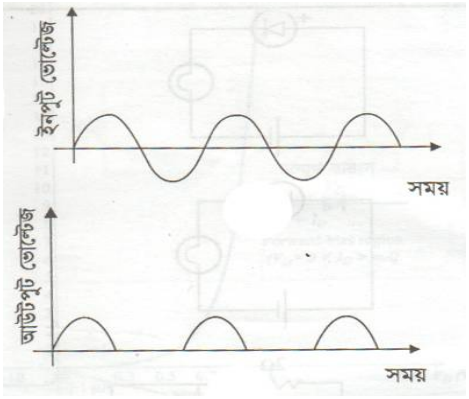

(খ)

চিত্র : ১০.১৪

১০.১৪ (ক) চিত্রে একটি *p-n* জাংশন কীভাবে অর্ধতরঙ্গ রেফটিফায়ার হিসেবে কাজ করে তার বর্তনী দেখানো হয়েছে। যে এসি ভোল্টেজকে আমরা রেকটিফাই করতে চাই সেটি ডায়োড এবং লোড রেজিস্ট্যান্স R_Lএর সাথে শ্রেণিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। সাধারণত বর্তনীতে এসি ভোল্টেজকে ট্রান্সফরমার দ্বারা সরবরাহ করা হয়। লোড রেজিষ্ট্যান্স R_L এর দুইপ্রান্ড় থেকে আউটপুট বা বহির্গামী ভোল্টেজ নেয়া হয়। আমরা জানি, ইনপুট বা অন্ড়র্গামী ভোল্টেজ এর একটি পুর্ণ চক্রে দুটি অর্ধচক্র থাকে। একটি ধনাত্মক অর্ধচক্র এবং একটি ঋণাত্মক অর্ধচক্র [চিত্র ১০. ১৪ (খ)]। ফলে উৎস ভোল্টেজ বা ইনপুট ভোল্টেজের প্রতি চক্রের (Cycle) এক অর্ধচক্রে *p-n* জাংশনটি সম্মুখী ঝোঁকে এবং অপর অর্ধচক্রে বিমুখী ঝোঁকে থাকবে। ইনপুট এসি ভোল্টেজের ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য, গৌণকুন্ডলীর A প্রান্ড়B প্রান্ড়র তুলনায় ধনাত্মক ভোল্টেজে থাকে [চিত্র ১০.১৪. (ক)]। ফলে *p-n* জাংশনটি সম্মুখী বায়াস বা ঝোঁকে থাকে। যার ফলে বর্তনীতে সংযুক্ত লোড রেজিষ্ট্যান্স R_L এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। আবার ঋণাত্মক অর্ধচক্রের জন্য, গৌণকুন্ডলীর A প্রান্ড়B প্রান্ড়র তুলনায় ঋণাত্মক ভোল্টেজে থাকে। ফলে *p-n* জাংশনটি বিমুখী ঝোঁক বা বায়াসে থাকে। যার প্রেক্ষিতে লোড রেজিষ্ট্যান্স R_L এর মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হয় না এবং R_L এর দুই প্রান্ড়ে কোনো বিভব পার্থক্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজ শূন্য হয়। এই প্রক্রিয়া বার বার চলতে থাকে। সুতরাং ইনপুট ভোল্টেজের শুধু ধনাত্মক অর্ধচক্রগুলোর জন্য ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। অপরদিকে ঋণাত্মক অর্ধচক্রগুলোতে ডায়োডের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রোধের ভিতর দিয়ে একটি বিরতিযুক্ত কিন্তু সর্বদা একমুখী প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে। রোধের দুই প্রান্ড়ে প্রাপ্ত ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ ১০.১৪(খ) চিত্রে দেখানো হয়েছে। লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, এসি সরবরাহের একটি পূর্ণ চক্রের উপর অর্ধের (Upper half cycle) জন্য R_L রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ পাওয়া গেলেও নিম্ন অর্ধেক (Lower half cycle) এর জন্য কোনো প্রবাহ পাওয়া যায় না। পূর্ণ চক্রের এক অর্ধের জন্য প্রবাহ পাওয়া যায় বলে এবং এই প্রবাহের দিক একই থাকে বলে অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার বলে।

১০.৬.৩ পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার
Full Wave Rectifier

পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকরণে ইনপুট এসি(ac) ভোল্টেজের উভয় অর্ধচক্রে লোডের মধ্য দিয়ে একই দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইনপুট ভোল্টেজের দুটি চক্রই কাজে লাগানো হয় । এজন্য বর্তনীতে দুটি p-n জাংশন ডায়োড সমান্ড়রালে ব্যবহার করা হয় । ১০.১৫(ক) চিত্রে একটি পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার বর্তনী দেখানো হয়েছে। এখানে D_1 ও D_2 ডায়োড দুটিকে একটি সেন্টার টেপ টান্সফর্মারের গৌণ কুন্ডলী AB এর সাথে সংযোগ দেয়া হয়েছে যাতে করে প্রত্যেকটি ডায়োড ইনপুট এসি ভোল্টেজের একটি অর্ধচক্র কাজে লাগায়।

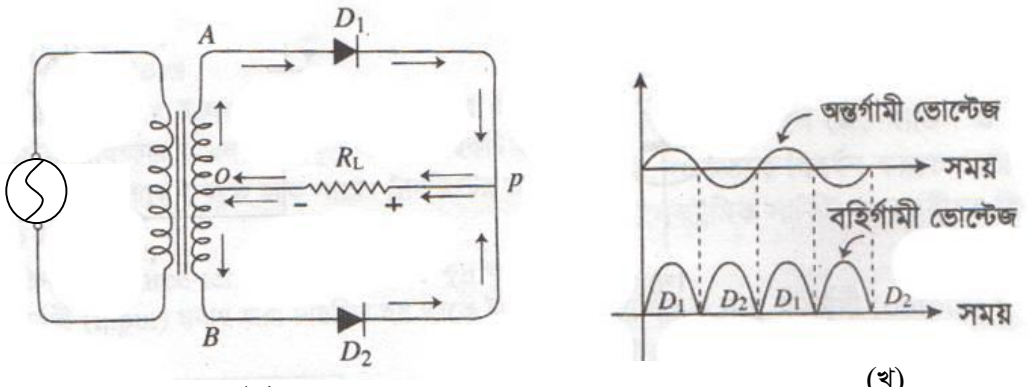

(ক) (খ)

চিত্র : ১০.১৫

অর্থাৎ গৌণ কুন্ডলীর উপরের অর্ধাংশে (OA অংশে) আগত এসি ইনপুট ভোল্টেজকে ডায়োড D_1 রেকটিফাই করে এবং ডায়োড D_2 গৌণকুন্ডলীর OB অংশে অংশে আগত নিচের অর্ধাংশকে রেকটিফাই করে।

কার্যপদ্ধতি : এসি ইনপুট ভোল্টেজের ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য গৌণ কুন্ডলীর A প্রান্ড় ধনাত্মক এবং B প্রান্ড় ঋণাত্মক হয়। ফলে ডায়োড D_1 সম্মুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু D_2 ডায়োড বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হওয়ায় এবং মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বর্তনীতে OAD_1PO পথে তড়িৎ প্রবাহিত হয় [চিত্র ১০.১৫ (ক)]। ইনপুট এসি ভোল্টেজের দ্বিতীয় অর্ধচক্রের জন্য, গৌণকুন্ডলীর A প্রান্ড় ঋণাত্মক এবং B প্রান্ড় ধনাত্মক হয়। ফলে ডায়োড D_2 সম্মুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু D_1 বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। এক্ষেত্রে বর্তনীতে OBD_2PO পথে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। সুতরাং চিত্র হতে দেখা যায় যে, লোড রেজিস্ট্যান্স R_L এর মধ্য দিয়ে উভয় অর্ধচক্রের জন্য তড়িৎ একই দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ লোড R_L এর মধ্য দিয়ে একমুখী বা ডিসি তড়িৎ প্রবাহিত হয়। চিত্রে অন্ড়র্গামী এবং বহির্গামী ভোল্টেজ তথা প্রবাহ এর তরঙ্গরূপ দেখানো হয়েছে। অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে যেখানে শুধুমাত্র অর্ধচক্রের জন্য বহির্গামী ভোল্টেজ পাওয়া যায়, সেখানে পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে পূর্ণচক্রের [চিত্র ১০.১৫ (খ)] জন্য বহির্গামী ভোল্টেজ পাওয়া যায় ফলে একে পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার বলে।

১০.৬.৪ পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ার

Full Wave Bridge Rectifier

চারটি ডায়োড ব্যবহার করে পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করা হয়। D_1, D_2, D_3 এবং D_4 চারটি ডায়োড (চিত্র ১০.১৬)-এর ন্যায় সংযোগ করে একটি ব্রিজ গঠন করা হয়। রেকটিফাই বা একমুখী করার জন্য এসি উৎসকে একটি ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ব্রিজের কোনার দুই বিপরীত প্রান্ড়ে চিত্রানুযায়ী সংযোগ দেওয়া হয়। অন্য দুই বিপরীত কোনার সাথে সংযোগ দেওয়া হয় লোড রেজিস্টান্স R_L।

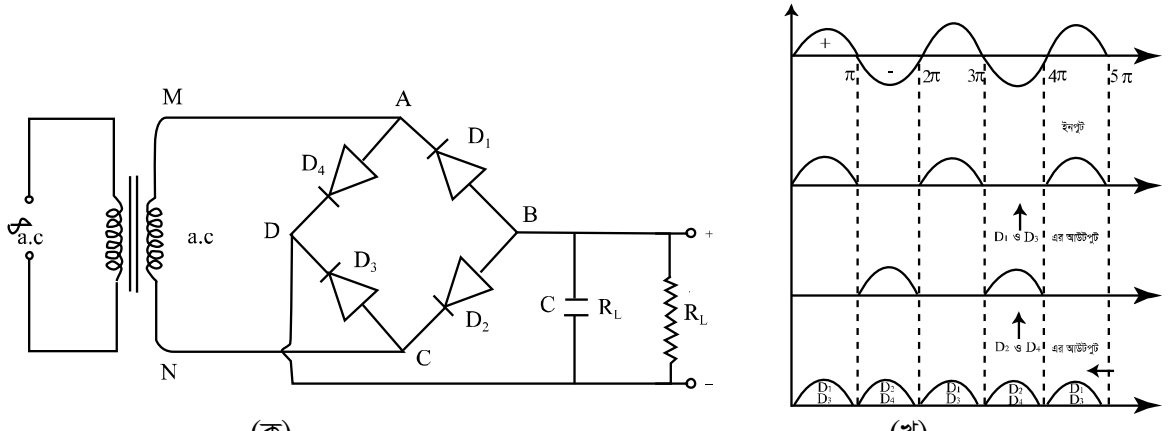

(ক) (খ)

চিত্র : ১০.১৬

কার্যপদ্ধতি : পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারে এসি অন্তর্গামী উৎসের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুই অর্ধচক্রই কাজে লাগানো হয়। গৌণ ভোল্টেজের ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য ট্রান্সফার্মারের M প্রান্ত ধনাত্মক এবং N প্রান্ত ঋণাত্মক হয়। এ অবস্থায় ডায়োড D_1 ও D_3 সম্মুখ ঝোঁক এবং ডায়োড D_2 ও D_4 বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয়। ফলে D_1 ও D_3 ডায়োড পরিবাহী এবং D_2 ও D_4 ডায়োড অন্তর্কের কাজ করে। সুতরাং শুধুমাত্র D_1 ও D_3 ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। D_1 ও D_2 ডায়েড দুটি লোড রেজিস্টান্স R_L–এর সাথে শ্রেণি সমবায় সংযুক্ত হয়। তড়িৎ A থেকে লোড রেজিস্টান্স R_L এর মধ্য দিয়ে B এর দিকে প্রবাহিত হবে। R_L-এর দুই প্রান্তে ডিসি বহির্গামী পাওয়া যাবে [চিত্র ১০.১৬(খ)]।

গৌণ ভোল্টেজের ঋণাত্মক অর্ধচক্রের জন্য ট্রান্সফার্মারের M প্রান্ত ঋণাত্মক এবং N প্রান্ত ধনাত্মক হয়। এ অবস্থায় ডায়োড D_2 ও D_4 সম্মুখ ঝোঁক এবং ডায়োড D_1 ও D_3 বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয়। ফলে D_2 ও D_4 ডায়োড পরিবাহী এবং D_1 ও D_3 ডায়োড অন্তর্কের কাজ করে। সুতরাং শুধুমাত্র D_2 ও D_4 ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। D_2 ও D_4 ডায়োড দুটি লোড রেজিস্টান্স R_L এর সাথে শ্রেণি সমবায়ে সংযুক্ত হয়। তড়িৎ A থেকে লোড রেজিস্টান্স R_L-এর মধ্য দিয়ে B এর দিকে প্রবাহিত হবে। R_L-এর দুই প্রান্তে ডিসি বহির্গামী পাওয়া যাবে [চিত্র ১০.১৬(খ)]।

সার-সংক্ষেপ :

রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণ: যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating current) বা ভোল্টেজকে একমুখী প্রবাহ (Direct current- ডিসি) বা ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয় তাকে রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণ বলে।

অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার : এসি সরবরাহের একটি পূর্ণ চক্রের উপর অর্ধের জন্য লোড রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ পাওয়া গেলেও নিম্ন অর্ধেক এর জন্য কোনো প্রবাহ পাওয়া যায় না। পূর্ণ চক্রের এক অর্ধের জন্য প্রবাহ পাওয়া যায় বলে এবং এই প্রবাহের দিক একই থাকে বলে অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার বলে।

পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার : অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে যেখানে শুধুমাত্র অর্ধচক্রের জন্য বহির্গামী ভোল্টেজ পাওয়া যায়, সেখানে পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে পূর্ণচক্রের জন্য বহির্গামী ভোল্টেজ পাওয়া যায় ফলে একে পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৬

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাংশন ডায়োড সাধারণত কি কাজে ব্যবহার করা হয়?
- (ক) সুইচ হিসেবে
- (খ) রেকটিফায়ার হিসেবে
- (গ) বিবর্ধক হিসেবে
- (গ) স্পন্দক হিসেবে

২। পূর্ণতরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ার বর্তনীতে ব্যবহৃত ডায়োডের সংখ্যা–
- (ক) একটি
- (খ) দুইটি
- (গ) তিনটি
- (ঘ) চারটি

পাঠ-১০.৭ : ট্রানজিস্টর
Transistor

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জাংশন ট্রানজিস্টরের গঠন ও বায়াসিং (ঝোঁক) কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ট্রানজিস্টর (Transistor) হচ্ছে একটি ইংরেজি শব্দ। Transfer এবং Resistor এই দুটি পৃথক ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে Transistor শব্দটি গঠিত হয়েছে। ট্রানজিস্টরকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যায়। ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্স এর জগতে বিপণ্ঢব সংঘটিত করেছে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির তিনজন গবেষক জে. বার্ডিন (J.Bardeen) , ডবিণ্ঢউ ব্রাটেন (W. Brattain) ও ডবিণ্ঢউ সক্লে (W. Shockley) ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। এই গুর"ত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তিনজনকে ১৯৫৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। ট্রানজিস্টর দুর্বল তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চগতিসম্পন্ন সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সংজ্ঞা ঃ দুটি একই ধরনের অর্ধপরিবাহীর (*n*-টাইপ অথবা *p*-টাইপ) মাঝখানে এদের বিপরীত ধরনের (*p*-টাইপ অথবা *n*-টাইপ) অর্ধপরিবাহী বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে যুক্ত করে যে যন্ত্র বা কৌশল (Device) তৈরি করা হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে।

সুতরাং একটি জাংশন ট্রানজিস্টর দুটি *p-n* জাংশনের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর তিনটি প্রান্ড় রয়েছে।
গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে জাংশন ট্রানজিস্টর দুই প্রকারঃ
(১) *p-n-p* ট্রানজিস্টর এবং
(২) *n-p-n* ট্রানজিস্টর।

১০.৭.১ *p-n-p* ও *n-p-n* ট্রানজিস্টরের গঠন
Construction of p-n-p and n-p-n transistor

একটি *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর পাতলা স্ড়রের দুপাশে *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর প্রশস্ড় স্ড়র যুক্ত করে *n-p-n* টানজিস্টর তৈরি করা হয় [চিত্র : ১০.১৭(ক)]।

আবার একটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর পাতলা স্ড়রের দুপাশে *p*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর প্রশস্ড় স্ড়র যুক্ত করে *p-n-p* ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয় [চিত্র ১০.১৭ (খ)]।

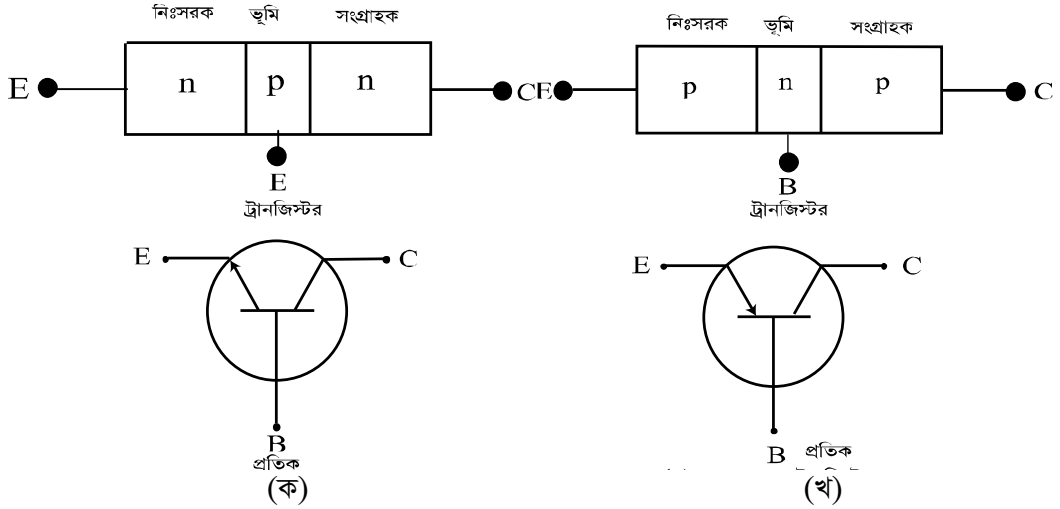

চিত্র : ১০.১৭

একটি ট্রানজিস্টরের তিনটি সেকশন বা অংশ রয়েছে। এই তিনটি খন্ড থেকে তিনটি টার্মিনাল বের করা হয়। ট্রানজিস্টরের এক প্রান্তে অবস্থিত খন্ডকে এমিটার বা নিঃসারক এর বিপরীত পাশে অবস্থিত খন্ডকে কালেক্টর বা সংগ্রাহক এবং মাঝখানে অবস্থিত খন্ডটিকে বেস বা ভূমি বলে। বেস বা ভূমি দু'পাশে অবস্থিত এমিটার এবং কালেক্টর এর সাথে দুটি p-n জাংশন গঠন করে।

এমিটার বা নিঃসরক (Emitter) ঃ ট্রানজিস্টরের এক পাশের অংশ যা আধান বাহক (হোল বা ইলেকট্রন) সরবরাহ করে তাকে এমিটার বা নিঃসরক বলে। নিঃসরককে ভূমি সাপেক্ষে সর্বদা সম্মুখী ঝোঁক প্রয়োগ করা হয়। ফলে নিঃসরক বেশি পরিমাণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আধান বাহক সরবরাহ করে।

কালেক্টর বা সংগ্রাহক (Collector) ঃ ট্রানজিস্টরের অন্য পাশের অংশ যা আধান সংগ্রহ করে তাকে কালেক্টর বা সংগ্রাহক বলে। সংগ্রাহককে সর্বদা বিমুখী ঝোঁক প্রয়োগ করা হয়।

বেস বা ভূমি (Base) : ট্রানজিস্টরের এমিটার ও কালেক্টরের মাঝের অংশটিকে বেস বা ভূমি বলে। এটি এমিটার ও কালেক্টর এর সাথে দুটি p-n জাংশন গঠন করে। বেস খুবই পাতলা এবং এটিকে অল্প পরিমাণে ডোপিং করা হয়। ট্রানজিস্টরের এমিটার এবং কালেক্টর উভয়কেই বেস অপেক্ষা বেশি ডোপিং করা হয় এবং উভয়েরই পুরুত্ব বেশি হয়।

ট্রানজিস্টরের ভূমি-নিঃসারক জাংশনে সম্মুখী বায়াস প্রদান করা হয়, যাতে করে নিঃসারক বর্তনীর রোধ অনেক কম হয়। অন্যদিকে, ভূমি সংগ্রাহক জাংশনে বিমুখী বায়াস প্রদান করা হয়, এর ফলে সংগ্রাহক বর্তনীর রোধ অনেক বৃদ্ধি পায়। ১০.১৭ চিত্রে ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টরের প্রতীক দেখানো হয়েছে।

১০.৭.২ জাংশন ট্রানজিস্টরের বায়াসিং ও কার্যপদ্ধতি বা কার্যক্রম
Biasing of Junction Transistor and Working Procedure

***p-n-p* ট্রানজিস্টরের কার্যপদ্ধতি**

একটি ট্রানজিস্টরের দুটি জাংশন রয়েছে। ট্রানজিস্টরের দুটি জাংশনকে দুভাবে সংযোগ প্রদান করা হয়। (১০.১৮) চিত্রে *p-n-p* ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে বায়াসিং কার্যক্রম দেখানো হয়েছে।

এখানে এমিটার- বেস জাংশনে সম্মুখী বায়াস এবং কালেক্টর-বেস জাংশনে বিমুখী বায়াস প্রয়োগ করা হয়েছে। এমিটার-বেস জাংশন সম্মুখী ঝোঁকে থাকায় *p*-অঞ্চলের বা এমিটার এর হোলগুলো ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে বেসের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এমিটার প্রবাহ I_E সৃষ্টি করে। হোলগুলো যখন *n*-টাইপ ভূমি বা বেস অতিক্রম করে তখন এগুলো ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হতে চায়। কিন্তু বেসের পুরুত্ব কম হওয়ায় এবং হালকাভাবে ডোপিং এর ফলে খুব সামান্য পরিমাণ হোল (5% এর কম) ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হয় এবং খুব সামান্য বেস প্রবাহ I_B সৃষ্টি হয়।

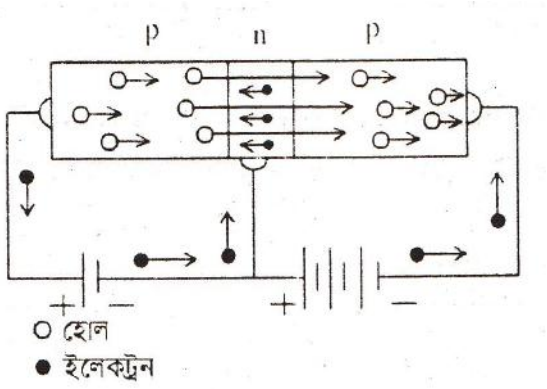

চিত্র ১০.১৮

বাকী প্রায় 95% হোল বেস ভেদ করে ঋণাত্মক কালেক্টর ভোল্টেজের আকর্ষণে কালেক্টরে গিয়ে পৌছায় এবং কালেক্টর প্রবাহ I_C তৈরি করে। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ এমিটার প্রবাহ কালেক্টর বর্তনীতে প্রবাহিত হয়। সুতরাং কালেক্টর বর্তনীর প্রবাহ এমিটার প্রবাহের উপর নির্ভর করে। প্রায় 5% হোল ভূমিতে ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হওয়ায় সামান্য পরিমাণ বেস প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ফলে কালেক্টর প্রবাহ এমিটার প্রবাহ অপেক্ষা সামান্য কম হয়। এমিটার প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে অধিক পরিমান হোল বেসে প্রবেশ করে যা কালেক্টরের ঋণাত্মক ভোল্টেজ দ্বারা আকর্ষিত হয়, ফলে কালেক্টর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এভাবে এমিটার প্রবাহ দ্বারা কালেক্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, *p-n-p* ট্রানজিস্টরের ভেতরে তড়িৎ প্রবাহ হয় হোল এর প্রবাহের জন্য। কিন্তু বাহ্যিক সংযোগ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য।

***n-p-n* ট্রানজিস্টরের কার্যক্রম :** *n-p-n* ট্রানজিস্টরকে কার্যকর করার জন্য এর দুটি জাংশনকে দু'ভাবে বায়াস করা হয়। ১০.১৯ নং চিত্রে ট্রানজিস্টরের এমিটার-বেস জাংশনে সম্মুখী বায়াস এবং কালেক্টর বেস জাংশনে বিমুখী বায়াস প্রয়োগ করা হয়েছে।

এমিটার বেস জাংশনে সম্মুখী ঝোঁকে থাকায় এমিটার হতে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে জাংশন ভেদ করে বেসের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে এমিটার প্রবাহ I_E তৈরি করে। ইলেকট্রনগুলো যখন p টাইপ বেসে প্রবেশ করে, তখন এগুলো সেখানকার হোলের সাথে মিলিত হতে চায়। কিন্তু বেস খুব পাতলা হওয়ার কারণে এবং হালকাভাবে ডোপিং এর ফলে খুব সামান্য পরিমাণ (5% এর কম) ইলেকট্রন হোলের সাথে মিলিত হয়।

এরূপ মিলনের ফলে খুব সামান্য বেস প্রবাহ I_B সৃষ্টি হয়। বাকী প্রায় 95% ইলেকট্রন বেস অঞ্চল ভেদ করে ধনাত্মক কালেক্টর ভোল্টেজের আর্কষণে কালেক্টর অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কালেক্টর প্রবাহ I_C সৃষ্টি করে। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ এমিটার প্রবাহ কালেক্টর বর্তনীতে প্রবাহিত হয়। কালেক্টর জাংশনে আগত ইলেকট্রন কালেক্টর প্রান্তে প্রযুক্ত ধনাত্মক বিভবেব আকর্ষণে কালেক্টর প্রবাহ বৃদ্ধি করে। প্রায় 5% ইলেকট্রন বেসে হোলের সাথে মিলিত হওয়ায় ফলে সামান্য পরিমান বেস প্রবাহ সৃষ্টি হয়। যার প্রেক্ষিতে কালেক্টর প্রবাহ এমিটার প্রবাহ অপেক্ষা সামান্য কম হয়।

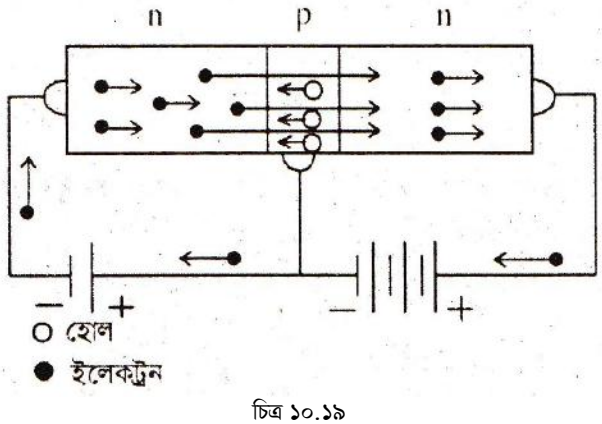

চিত্র ১০.১৯

এমিটার প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন বেসে প্রবেশ করে, যা কালেক্টরের ধনাত্মক বিভব দ্বারা আকর্ষিত হয়। ফলে কালেক্টর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এ প্রক্রিয়ার এমিটার প্রবাহ দ্বারা কালেক্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

n-p-n ট্রানজিস্টরের ভেতরে তড়িৎপ্রবাহ হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য এবং বর্তনীর সংযোগ তারের মধ্যেও তড়িৎ প্রবাহ ইলেকট্রনের জন্য হয়ে থাকে।

ট্রানজিস্টরে বিভিন্ন প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক

ধরা যাক, এমিটার প্রবাহ = I_E

বেস প্রবাহ = I_B

ও কালেক্টর প্রবাহ = I_C

কার্শফের সূত্র অনুসারে, এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো,

$$I_E = I_B + I_C \quad \text{.....(১০.১)}$$

অর্থাৎ কালেক্টর প্রবাহ সর্বদা এমিটার প্রবাহ অপেক্ষা কম হয়।

সমীকরণ (১০.১) থেকে পাই,

$$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C \quad \text{..... .....(১০.২)}$$

এখানে ΔI_E, ΔI_B ও ΔI_C যথাক্রমে এমিটার প্রবাহ, বেস প্রবাহ ও কালেক্টর প্রবাহের পরিবর্তন নির্দেশ করে।

ট্রানজিস্টরের মৌলিক সার্কিট (Three Basic Circuits) : তিনটি উপায়ে ট্রানজিস্টরকে বর্তনীতে সংযোগ দেয়া যায় এগুলো হলো :

১। কমন বেস কনফিগারেশন (Common Base Configuration)।

২। কমন এমিটার কনফিগারেশন (Common Emitter Configuration)।

৩। কমন কালেক্টর কনফিগারেশন (Common Collector Configuration)।

১। কমন বেস কনফিগারেশন : *p-n-p* বা *n-p-n* ট্রানজিস্টরের এমিটার ও বেসের মধ্যে ইনপুট সিগনাল প্রয়োগ করে কালেক্টর বেস সার্কিট থেকে আউটপুট সংকেত পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে বেস কমন বা সাধারণ ভূমিকা পালন করে।

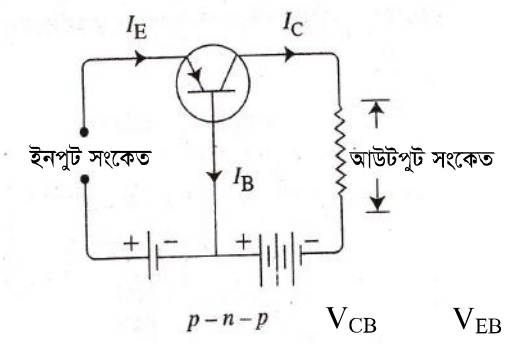

চিত্র ১০.২০

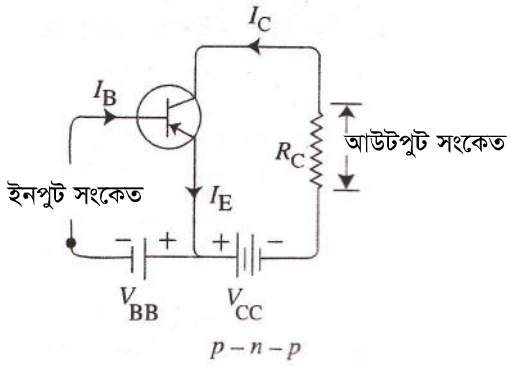

চিত্র : ১০.২১

২। কমন এমিটার কনফিগারেশন : *p-n-p* বা *n-p-n* ট্রানজিস্টরের বেস ও এমিটারের মধ্যে ইনপুট সিগনাল প্রয়োগ করে কালেক্টর এমিটার সার্কিট থেকে আউটপুট সংকেত পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে এমিটার কমন বা সাধারণ ভূমিকা পালন করে।

কমন কালেক্টর কনফিগারেশন : *p-n-p* বা *n-p-n* ট্রানজিস্টরের বেস ও কালেক্টরের মধ্যে ইনপুট সিগনাল প্রয়োগ করে কালেক্টর এমিটার সার্কিট থেকে আউটপুট সংকেত পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে ইনপুট এবং আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে কালেক্টর কমন বা সাধারণ ভূমিকা পালন করে।

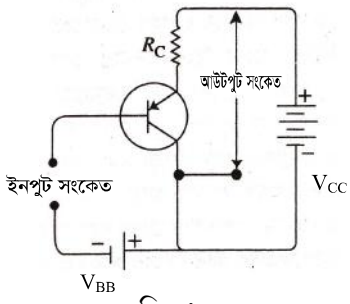

চিত্র ১০.২২

অ্যাম্পলিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে ট্রানজিস্টর

Transistor as an Amplifier

যে যন্ত্র তার ইনপুটে (Input) প্রদত্ত সংকেতকে আউটপুটে (Output) বিবর্ধিত করে তাকে অ্যামপিণ্ডফায়ার বা বিবর্ধক বলে।

ইলেকট্রনিক এম্পলিফায়ার দুর্বল অন্তর্গামী (Input) সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী (Output) সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর বিবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (১০.২৩) চিত্রে একটি সাধারণ এমিটার বিবর্ধকের বর্তনী দেখানো হয়েছে। ইনপুট সার্কিটে বেস ও এমিটারের মধ্যে একটি ডিসি ভোল্টেজ (V_{BB}) প্রয়োগ করা হয় যাতে এমিটার-বেস জাংশন সর্বদা সম্মুখী বায়াসে থাকে। সুতরাং ইনপুট এসি সিগনালের নেগেটিভ অর্ধচক্রের সময়ও জাংশন সন্মুখ বায়াসে থাকে। আউটপুট বর্তনীতে V_{cc} ব্যাটারির সাহায্যে কালেক্টর ও এমিটারের মধ্যে বিমুখী বায়াস প্রদান করা হয়।

চিত্রে : ১০.২৩

সম্মুখী ঝোঁক থাকার ফলে ইনপুট সার্কিটে রোধ খুব কম হয়। বিমুখী ঝোঁকের কারণে আউটপুট সার্কিটের রোধ অনেক বেশি। আউটপুট বর্তনীতে একটি উচ্চ রোধ R_L সংযুক্ত করা হয়। এমিটার-বেস জাংশনে একটি দুর্বল সংকেত প্রদান করা হয় এবং কালেক্টর বর্তনীতে সংযুক্ত লোড রোধ R_L থেকে আউটপুট সংকেত গ্রহণ করা হয়।

ইনপুট ও আউটপুটে অনুকূল ডিসি বায়াস থাকার ফলে, এমিটার, বেস ও কালেক্টর ডিসি প্রবাহ শুরু হয়। ইনপুটে প্রদত্ত এসি সংকেতের ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য এমিটার-বেস জাংশনের সন্মুখ বায়াস বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক পরিমান ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেসের মধ্য দিয়ে কালেক্টরে প্রবাহিত হয় এবং কালেক্টর প্রবাহ I_C বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত কালেক্টর প্রবাহ, কালেক্টর লোড রোধ R_L এর দুই প্রান্তে বর্ধিত বিভব পার্থক্য বা বিভব পতন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আউটপুটে অধিক ভোল্টেজ পাওয়া যায়। আবার এসি সংকেতের ঋণাত্মক অর্ধচক্রের জন্য এমিটার-বেস জাংশনের সম্মুখী ঝোঁক কমে যায়। ফলে কালেক্টর প্রবাহও কমে যায়। কালেক্টর প্রবাহ কমে যাওয়ায় বর্তনীর আউটপুট ভোল্টেজ কম হয় তবে তা ইনপুট সিগনাল থেকে বেশি হয়। ফলে ইনপুট সংকেতের একটি বর্ধিত (Amplified) রূপ আউটপুট বর্তনী বা লোড রোধের বিপরীতে পাওয়া যায়। এভাবে ট্রানজিস্টর কোনো দুর্বল সংকেতকে বিবর্ধিত করে।

দশা পরিবর্তন (Phase reversal) : সাধারণ এমিটার বর্তনীতে, যখন এসি ইনপুট ভোল্টেজ ধনাত্মক দিকে বাড়তে থাকে, তখন এসি আউটপুট ভোল্টেজ ঋণাত্মক দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার এসি ইনপুট ভোল্টেজ যখন ঋণাত্মক দিকে বাড়তে থাকে, তখন এসি আউটপুট ভোল্টেজ ধনাত্মক দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ সাধারণ এমিটার ব্যবস্থায়, ইনপুট ও আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে সর্বদা $180°$ দশা পার্থক্য বজায় থাকে।

ট্রানজিস্টর অ্যামপিণ্ডফায়ার এর ব্যবহার :

১। ইন্টারকমে ব্যবহার করা হয়।
২। রেডিওতে ব্যবহার করা হয়।
৩। মাইকে ব্যবহার করা হয়।
৪। অ্যালার্ম বর্তনীতে ব্যবহার করা হয়।

প্রবাহ বিবর্ধক গুণক (Current Amplication Factor)

কমন বেস কনফিগারেশন : এ ক্ষেত্রে ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে এমিটার কারেন্ট I_E, আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট I_C। ধরা যাক, এমিটার কারেন্টের ΔI_E পরিবর্তনের জন্য কালেক্টর কারেন্টের পরিবর্তন ΔI_C হয়। কালেক্টর ও বেসের মধ্যে স্থির ভোল্টেজ = V_{CB}

V_{CB} ধ্রুব থাকা অবস্থায় ΔI_C ও ΔI_E এর অনুপাতকে প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বলে। একে α দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \quad [\text{এখন } V_{CB} = \text{ধ্রুবক}] \quad \ldots\ldots (১০.৩)$$

ডিসি (*D.C.*) কারেন্টের ক্ষেত্রে,

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad [V_{CB} = \text{ধ্রুবক}] \quad \ldots\ldots (১০.৪)$$

α- এর মান 1 এর চেয়ে কম হয়। সাধারণ ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে α এর মান 0.97 থেকে 0.99 হয়।

প্রবাহ লাভ (Current gain)

কমন এমিটার কনফিগারেশন : এ ক্ষেত্রে ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে বেস কারেন্ট I_B, আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট I_C । ধরা যাক, বেস কারেন্টের ΔI_B পরিবর্তনের জন্য কালেক্টর কারেন্টের ΔI_C পরিবর্তন হয়। কালেক্টর ও এমিটারের মধ্যে ভোল্টেজ= V_{CE}

V_{CE} ধ্রুব থাকা অবস্থায় ΔI_C ও ΔI_B এর অনুপাতকে প্রবাহ লাভ বলে। একে β দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \quad [\text{যখন } V_{CE} = \text{ধ্রুবক}] \quad \ldots\ldots (১০.৫)$$

ডিসি (D.C.) কারেন্টের ক্ষেত্রে ,

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad [V_{CE} = \text{ধ্রুবক}] \quad \ldots\ldots (১০.৬)$$

সাধারণ ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে β এর মান 20 থেকে 500 হয়।

β ও α এর মধ্যে সম্পর্ক : ট্রানজিস্টরের কমন বেস কনফিগারেশন থেকে পাওয়া যায় প্রবাহ বিবর্ধন গুণক,

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \quad \ldots\ldots (১০.৭)$$

ট্রানজিস্টরের কমন এমিটার কনফিগারেশন থেকে পাওয়া যায় প্রবাহ লাভ,

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \quad \ldots\ldots \ldots\ldots (১০.৮)$$

আবার, $I_E = I_B + I_C$

অতএব $\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$

বা, $\Delta I_B = \Delta I_E - \Delta I_C$

সমীকরণ ১০.৮ এ ΔI_B এর মান বসিয়ে পাই,

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E - \Delta I_C} \quad \text{বা, } \beta = \frac{\frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}}{\frac{\Delta I_E}{\Delta I_E} - \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}}$$

$$\text{বা, } \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots (১০.৯) \quad [\text{ যেহেতু } \alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}]$$

সমীকরণ (১০.৯) থেকে পাই

$\beta (1-\alpha)=\alpha$

বা, $\beta - \beta \alpha = \alpha$

বা, $\beta = \alpha + \beta \alpha$

বা, $\beta = \alpha(1 + \beta)$

$$\therefore \alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (১০.১০)$$

সমীকরণ (১০.৯) ও (১০.১০) α ও β এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

গাণিতিক উদাহরণ-১০.২ : একটি কমন বেস ট্রানজিস্টর বিন্যাসে 3.5 mA এমিটার কারেন্ট পরিবর্তনে 2.5 mA কালেক্টর কারেন্টের পরিবর্তন ঘটলে প্রবাহ বিবর্ধন গুণক α এর মান নির্ণয় কর।

আমরা জানি, $\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$

এখানে

এমিটার কারেন্টের পরিবর্তন, $\Delta I_E = 3.5$ mA

বা, $\alpha = \frac{2.5\times10^{-3}}{3.5\times10^{-3}}$

$\alpha = 0.714$

∴ প্রবাহ বিবর্ধন গুণক, α =0.714

$= 3.5\times10^{-3}$ A

কালেক্টর কারেন্টের পরিবর্তন, $\Delta I_C = 2.5$ mA

$= 2.5\times10^{-3}$ A

প্রবাহ বিবর্ধন গুণক, α =?

উ: 0.714

গাণিতিক উদাহরণ ১০.৩ : একটি কমন এমিটার ট্রানজিস্টর বিন্যাসে প্রবাহ বিবর্ধন গুণক $\beta = 40$ এবং এমিটার প্রবাহ 1 mA হলে ভূমি প্রবাহ নির্ণয় কর।

আমরা জানি,

$\beta = \frac{I_C}{I_B}$

বা, $I_C = \beta I_B$

আবার, $I_E = I_B + I_C$

$I_E = I_B + \beta I_B$

বা, $I_E = I_B\ (1+\beta)$

∴ $I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{1\times10^{-3}}{40+1} = 2.4\times10^{-5}$ A

∴ ভূমি প্রবাহ, $I_B = 24\times10^{-5}$ A

এখানে

$\beta = 40$

এমিটার প্রবাহ $I_E = 1$ mA

$= 1\times10^{-3}$A

ভূমি প্রবাহ, I_B =?

উ: 24×10^{-5} A

সার-সংক্ষেপ :

ট্রানজিস্টর ঃ দুটি একই ধরনের অর্ধপরিবাহীর (n-টাইপ অথবা p-টাইপ) মাঝখানে এদের বিপরীত ধরনের (p-টাইপ অথবা n-টাইপ) অর্ধপরিবাহী বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে যুক্ত করে যে যন্ত্র বা কৌশল (Device) তৈরি করা হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে।

এমিটার বা নিঃসরক ঃ ট্রানজিস্টরের এক পাশের অংশ যা আধান বাহক (হোল বা ইলেকট্রন) সরবরাহ করে তাকে এমিটার বা নিঃসারক বলে।

কালেক্টর বা সংগ্রাহক ঃ ট্রানজিস্টরের অন্য পাশের অংশ যা আধান সংগ্রহ করে তাকে কালেক্টর বা সংগ্রাহক বলে।

বেস বা ভূমি : ট্রানজিস্টরের এমিটার ও কালেক্টরের মাঝের অংশটিকে বেস বা ভূমি বলে।

অ্যামপিণ্ডফায়ার : যে যন্ত্র তার ইনপুটে (Input) প্রদত্ত সংকেতকে আউটপুটে (Output) বিবর্ধিত করে তাকে অ্যামপিণ্ডফায়ার বা বিবর্ধক বলে।

প্রবাহ বিবর্ধক গুণক: V_{CB} ধ্রুব থাকা অবস্থায় ΔI_C ও ΔI_E এর অনুপাতকে প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বলে।

প্রবাহ লাভ : V_{CE} ধ্রুব থাকা অবস্থায় ΔI_C ও ΔI_B এর অনুপাতকে প্রবাহ লাভ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৭

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ট্রানজিস্টরের মাঝখানের অর্ধপরিবাহীকে কী বলে?

(ক) বেস বা পীঠ (খ) নিঃসরক (গ) সংগ্রাহক (গ) দাতা

২। কোন ট্রানজিস্টর সাধারণ পীঠ সংযোগে রয়েছে এর পীঠ প্রবাহ 0.05 mA এবং সংগ্রাহক প্রবাহ 0.95 mA হলে, ট্রানজিস্টরের নিঃসরক প্রবাহ কত?

(ক) 0.85 mA (খ) 0.90 mA (গ) 1.0 mA (গ) 1.5 mA

পাঠ-১০.৮ : বিভিন্ন ধরনের নম্বর পদ্ধতি
Different Types of Number System

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাইনারি নম্বর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অক্টাল নম্বর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হেক্সাডেসিমেল নম্বর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৮.১ নম্বর পদ্ধতি : মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ হিসাব বা গণনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মূলত তখন থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে গণনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে থাকে। হাতের আঙ্গুল, দড়ির গিট, মাটিতে দাগ কাটা ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ প্রথম গণনা শুরু করে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে গণনার জন্য মানুষ বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করে। যেমন : রোমানরা পাঁচ এর জন্য 'V' ব্যবহার করত, দশ এর জন্য 'X' ব্যবহার করত। এভাবে গণনা বা হিসাবের প্রয়োজনে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন, বর্ণ, সংখ্যা ইত্যাদি প্রচলন শুরু হয়। সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করে কোনো কিছুর পরিমাপ করার কৌশলই হলো গণনা।এই সাংকেতিক চিহ্নসমূহকে নম্বর বা সংখ্যা বলে।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে নম্বর বা সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ এবং গণনা করা হয় তাকে সংখ্যা বা নম্বর পদ্ধতি বলে।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত
Base of number System

যেকোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নসমূহের মোট সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত বা বেস বলে। যেমন দশমিক বা ডেসিমেল পদ্ধতিতে দশটি মৌলিক চিহ্ন আছে। এগুলো হলো- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। সুতরাং এ পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস হলো 10। কোনো নম্বর পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ঐ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক প্রতীক সমূহের মোট সংখ্যা। যেমন – দশমিক পদ্ধতির ভিত্তি হলো 10, কারণ ঐ পদ্ধতিতে দশটি মৌলিক চিহ্ন বা প্রতীক আছে। একই ভাবে বলা যায়, বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিগুলো হলো যথাক্রমে 2 ভিত্তিক, 8 ভিত্তিক ও 16 ভিত্তিক নম্বর পদ্ধতি।

সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিতের ওপর নির্ভর করে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।
স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটির একটি স্থানিক মান থাকে। এ ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি চার ধরনের। যথা –

(১) ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)
(২) বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)
(৩) অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System)
(৪) হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexa-Decimal Number System)

নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)

আমাদের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশের জন্য বহুল ব্যবহৃত নম্বর পদ্ধতি হলো ডেসিমেল নম্বর বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতির ভিত্তি (Base) হলো 10। কারণ এই পদ্ধতিতে 10 টি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করা হয়। প্রতীকগুলো হলো 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9। এ পদ্ধতিতে মোট দশটি প্রতীক (অঙ্ক) ব্যবহার করা হয়, বলে এ নম্বর পদ্ধতিকে ডেসিমেল বা দশমিক নম্বর পদ্ধতি বলা হয়।

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যার প্রতিটি অংকের মান নির্ণয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য জানা প্রয়োজন।

(i) অংকটির নিজস্ব মান,

(ii) অংকটির অবস্থান বা স্থানীয় মান

(ii) ঐ নম্বর পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি।

ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতির একটি সংখ্যা 123.45 বিবেচনা করা যাক। এই সংখ্যাটিতে দশমিকের পূর্বের অংশ পূর্ণমান নির্দেশ করে এবং পরের অংশ ভগ্নাংশ নির্দেশ করে। ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতিতে অবস্থানের ওপর অংকের স্থানীয় মান নির্ভর করে। 123.45 সংখ্যাটির স্থানীয় মান নিচে দেখানো হলো:

$$(123.45)_{10} = 1\times10^{2} + 2\times10^{1} + 3\times10^{0} + 4\times10^{-1} + 5\times10^{-2}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

স্থানীয় মান $\rightarrow 100 + 20 + 3 + 0.4 + 0.05 = (123.45)_{10}$

২। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)

বাই (Bi) মানে দুই। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 এবং 1 এ দুটি অংক ব্যবহার করা হয়। এ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস হলো 2 । এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অংক 0 এবং 1 কে Binary Digit বা সংক্ষেপে বিট (Bit) বলে। কম্পিউটারে ডেটা ও তথ্য সংরক্ষণে এবং ডেটা কমিউনিকেশনে বিট মৌলিক একক হিসেবে কাজ করে। আটটি বিটের সমন্বয়ে এক বাইট (Byte) গঠিত হয়।

বাইনারি পদ্ধতিতে এই দুইটি প্রতীক 0 এবং 1 ব্যবহার করে আমরা যেকোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারি, যা ডেসিমেল পদ্ধতিতে 10 টি প্রতীক ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়। বাইনারি পদ্ধতিতে কেবল মাত্র দুই এর বিভিন্ন শক্তি বিশিষ্ঠ পদের সমষ্ঠি দিয়েই নম্বর বা সংখ্যা গঠন করা হয়। ডান থেকে বাম দিকের নম্বরগুলোর স্থানীয় মান যথাক্রমে 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 ইত্যাদি।

বাইনারি পদ্ধতি হলো সবচেয়ে সরল গণনা পদ্ধতি। তবে বাইনারি গণনায় ডেসিমেল পদ্ধতির তুলনায় বেশি অংকের দরকার হয় বলে সাধারণ ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার অসুবিধাজনক। কিন্তু ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এক সাথে অনেক বাইনারি অংক দ্বারা দ্রুতগতিতে গাণিতিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হয়। তাই ইলেকট্রনিক যন্ত্রে বিশেষ করে কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

নিচের সারণিতে ডেসিমেল নম্বরের সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণি ১০.১ : ডেসিমেল ও সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা

ডেসিমেল নম্বর	বাইনারি নম্বর
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

$(1101)_2$ বাইনারি সংখ্যটির স্থানীয় মান নিচে দেখানো হলো :

বাইনারি সংখ্যায় বেস হলো 2। নিচে দুটি বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমেল নম্বরে প্রকাশ করা হলো

$$(111)_2 = 1\times2^{2} + 1\times2^{1} + 1\times2^{0}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

স্থানীয় মান $\rightarrow 4 + 2 + 1 = (7)_{10}$

অতএব,

$$(111)_2 = (7)_{10}$$

আবার

$$(1101)_2 = 1\times2^{3} + 1\times2^{2} + 0\times2^{1} + 1\times2^{0}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

স্থানীয় মান $\rightarrow 8 + 4 + 0 + 1 = (13)_{10}$

৩। অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System)

অকটাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো 8 , কেননা এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক প্রতীকের সংখ্যা আটটি। প্রতীকগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7 । অর্থাৎ অক্টাল নম্বরের যে কোনো ডিজিট 0 হতে 7 পর্যন্ড় হতে পারে। আধুনিক কম্পিউটার উন্নয়নের প্রথম দিকে এ পদ্ধতি অত্যন্ড় জনপ্রিয় ছিল। ১০.২ সারণিতে অকটাল পদ্ধতির গণনারীতি দেখানো হলো

সারণি ১০.২ ডেসিমেল ও সমতুল্য অকটাল সংখ্যা

দশমিক পদ্ধতি	অকটাল সংখ্যা
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	10
9	11
10	12

$(152)_8$ অকটাল সংখ্যাটির স্থানীয় মান নিচে দেখানো হলো :

$$(152)_8 = 1\times8^2 + 5\times8^1 + 2\times8^0$$

$$(152)_8 = 1 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 2 \times 8^0$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

স্থানীয় মান $\rightarrow$ $64 \times 40 + 2 = (106)_{10}$

অতএব, $(152)_8 = (106)_{10}$

৪। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexa-Decimal Number System)

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস হলো 16 । এই পদ্ধতিতে 16 টি মৌলিক প্রতিক ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ও F । এখানে 10 হতে 15 ডিজিটগুলোকে A, B, C, D, E ও F দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, এবং F = 15।

হেক্সডিসিমেল নম্বর পদ্ধতি সকল প্রকার কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়।

$(20AF)_{16}$ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির স্থানীয় মান নিচে দেখানো হলো:

$$(20AF)_{16} = 2\times16^3+0\times16^2+10\times16^1+15\times16^0$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

স্থানীয় মান $\rightarrow$ $8192+0+160+15 = (8367)_{10}$ [যেহেতু, A = 10, F = 15]

অতএব, $(20AF)_{16} = (8367)_{10}$

সারণি ১০.৩ : দশমিক ও সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল, বাইনারি ও অকটাল সংখ্যা

দশমিক পদ্ধতি	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অকটাল সংখ্যা
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	10	2
3	3	11	3
4	4	100	4
5	5	101	5
6	6	110	6
7	7	111	7
8	8	1000	10
9	9	1001	11
10	A	1010	12
11	B	1011	13
12	C	1100	14
13	D	1101	15
14	E	1110	16
15	F	1111	17
16	10	10000	100
17	11	10001	101
18	12	10010	102
19	13	10011	103
20	14	10100	104

১০.৮.২ সংখ্যা বা নম্বর পদ্ধতির রূপান্ড়র

যেকোনো নম্বর পদ্ধতি থেকে ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতি থেকে রূপান্ড়র জন্য অর্থাৎ– বাইনারি, অকটাল, হেক্সাডেসিমেল নম্বর পদ্ধতিতে ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতিতে সংখ্যার রূপান্ড়রের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ণমান এবং ভগ্নাশের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য।

নিয়মসমূহ :

(ক) প্রথমে প্রদত্ত সংখ্যাটির ভিত্তি সনাক্ত করে সংখ্যাটির মধ্যে উপস্থিত প্রত্যেকটি অংকের স্থানীয় মান নির্ণয় করতে হবে।

(খ) সংখ্যাটির অন্ড়র্ভুক্ত প্রত্যেকটি অংকের নিজস্ব মানকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে।

(গ) প্রাপ্ত গুণফলগুলোর যোগফলই সমতুল্য দশমিক সংখ্যা হবে।

উদাহরণ :

n ভিত্তিক নম্বর পদ্ধতির কোনো সংখ্যা, যেমন- $(538.462)_n$ কে ডেসিমেল পদ্ধতিতে রূপান্তর :

$(538.462)_n = 5\times n^2 + 3\times n^1 + 8\times n^0 + 4\times n^{-1} + 6\times n^{-2} + 2\times n^{-3} = (?)$

ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

Transformation from Decimal to Binany

(ক) ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে

(১) আমরা জানি, বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2। তাই দশমিক বা ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যাটিকে পর্যায়ক্রমে 2 দ্বারা পূনঃপূন ভাগ করে যেতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাগফল শূন্য হয়।

(২) ভাগশেষ বা অবশিষ্ট অংকগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে সাজালেই বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।
নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি।

ডেসিমেল সংখ্যা 49 কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2	49	অবশিষ্ট
2	24	1 সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSB)
2	12	0
2	6	0
2	3	0
2	1	1
	0	1 সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSB)

সুতরাং, $(49)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো $(110001)_2$

$\therefore (49)_{10} = (110001)_2$

[নিজে কর :]

(i) $(63)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর। উঃ $(111111)_2$

(ii) $(83)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর। উঃ $(1010011)_2$

(খ) ডেসিমেল ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে -

কোনো ডেসিমেল নম্বরের ভগ্নাংশকে বাইনারি নম্বরে রূপান্তর করতে হলে –

(১) ডেসিমেল সংখ্যাটিকে 2 দ্বারা গুণ করতে হবে এবং গুণফল পূর্ণ সংখ্যা না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত ভগ্নাংশকে 2 দ্বারা গুণ করে যেতে হবে যতক্ষন না ভগ্নাংশ শূন্য হয়। গুণফলের পূর্ণ অংশকে আলাদা করে লিখতে হবে।

(২) যদি গুণফলের পূর্ণ অংশ 1 না থাকে তাহলে 0 দ্বারা লিখতে হবে। অতপর প্রতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অংশকে উপর থেকে নিচের দিকে পাশাপাশি সাজালেই সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন - 0.375 এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো –

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
	.375 × 2
0	.750 × 2
1	.50 × 2
1	.0

$\therefore (0.375)_{10} = (0.011)_2$

[নিজে কর :] (i) $(64.30)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ কর।
উঃ $(64.30)_{10} = (100000.01001)_2$

বাইনারি নম্বর থেকে ডেসিমেল নম্বরে রূপান্ড়র

(১) বাইনারি থেকে ডেসিমেলে রূপান্ড়রের জন্য প্রত্যেকটি ডিজিটের স্থানীয় মানকে 2 এর সূচক হিসেবে লিখতে হবে।
(২) কোনো ডিজিটের ডান পাশে যতটি ডিজিট থাকবে ঐ ডিজিটকে 2 এর তত সূচক দ্বারা গুণ করতে হবে।
(৩) প্রত্যেকটি ডিজিটকে 2 এর সূচক দ্বারা গুণ করে গুণফলগুলোর যোগফল থেকে সমতুল্য ডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যায়। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3} ইত্যাদি দ্বারা প্রথম থেকে পরপর গুণ করে গুণফলকে যোগ করে ডেসিমেল ভগ্নাংশ পাওয়া যায়।

উদাহরণ : $(101001)_2$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় প্রকাশ।

$$(101001)_2 = 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$
$$= 41$$

অতএব, $(101001)_2 = (41)_{10}$

নিজে কর : $(1010.11)_2$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্ড়র কর। উ ঃ $(10.75)_{10}$

ডেসিমেল সংখ্যাকে অকটালে রূপান্ড়র

(ক) ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে -

১। যেহেতু অকটাল সংখ্যার ভিত্তি 8, তাই ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যাটিকে পর্যায়ক্রমে 8 দ্বারা ভাগ করতে হবে, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য হয়।

২। তারপর ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে পাশাপাশি সাজালেই সমতুল্য অকটাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন - 385 ডেসিমেল সংখ্যাকে অকটালে রূপান্ড়র–

8	385	অবশিষ্ট
8	48	1 সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
8	6	0
	0	6 সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

$\therefore (385)_{10} = (601)_8$

(খ) ডেসিমেল ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে -

১। ডেসিমেল ভগ্নাংশ সংখ্যাটিকে 8 দ্বারা গুণ করতে হবে এবং গুণফল পূর্ণ সংখ্যা না হওয়া পর্যন্ড় প্রাপ্ত ভগ্নাংশকে 8 দ্বারা গুণ করে যেতে হবে। গুণফলের পূর্ণ অংশকে আলাদা করে লিখতে হবে।

২। যদি গুণফলের পূর্ণ অংশ 1 থেকে 7 এর মধ্যে না থাকে তাহলে 0 দ্বারা লিখতে হবে। অতপর প্রতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অংশকে উপর থেকে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজালেই সমতুল্য অকটাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন –$(0.475)_{10}$ কে অকটালে রূপান্ড়র দেখানো হলো –

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
	.475× 8
3	.80× 8
6	.40× 8
3	.20× 8
1	.60× 8
4	.80

$\therefore (0.475)_{10} = (0.36314...)_8$

ডেসিমেল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

(ক) ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে–

১। যেহেতু হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার ভিত্তি 16, তাই ডেসিমেল পূর্ণ সংখ্যাকে 16 দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত বারবার 16 দ্বারা ভাগ করে যেতে হবে।

২। তারপর ভাগশেষ সংখ্যাগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে পাশাপাশি সাজালেই সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ: $(495)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

16	495	অবশিষ্ট
16	30	15= F সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
16	1	14 =E ↑
16	0	1 সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

$\therefore (495)_{10} = (1EF)_{16}$

(খ) ডেসিমেল ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে -

(১) ডেসিমেল ভগ্নাংশটিকে 16 দ্বারা গুণ করতে হবে এবং গুণফল পূর্ণ সংখ্যা না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত ভগ্নাংশকে 16 দ্বারা গুণ করে যেতে হবে। গুণফলের পূর্ণ অংশকে আলাদা করে লিখতে হবে।

(২) যদি গুণফলের পূর্ণ অংশ 1 থেকে 15 এর মধ্যে না থাকে তাহলে 0 দ্বারা লিখতে হবে। এরপর প্রতি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণ অংশকে উপর থেকে নিচের দিকে সাজালেই সমতুল্য অকটাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন - $(0.475)_{10} = (?)_{16}$

পূর্ণ অংশ	ভগ্নাংশ
	.475
	× 16
7 ↓	.60
	× 16
9	.60

$\therefore (0.475)_{10} = (0.799...)_{16}$

বাইনারি সংখ্যাকে অকটালে রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে অকটাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে 0 থেকে 7 পর্যন্ত অকটাল নম্বরগুলোর বাইনারি মান মনে রাখলে সুবিধা হবে। নিচের টেবিলে অকটাল নম্বরগুলোর বাইনারি মান দেয়া হলো :

অকটাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

(ক) বাইনারি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে -

১। বাইনারি সংখ্যার ডান দিক থেকে প্রতি তিনটি বিট একত্রে নিয়ে গ্রুপ করে বাম দিকে আসতে হবে এবং বাম দিকের গ্রুপ খালি থাকলে 0 দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

২। এরপর প্রতিটি ভাগকে তার সমতুল্য অকটাল অংক (0 থেকে 7 পর্যন্ড়) দিয়ে নির্দিষ্ট করতে হবে। অংকগুলোকে বাম থেকে ডানে দিকে সাজালেই অকটাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

যেমন- $(11111011)_2$ কে অকটাল সংখ্যায় রূপান্ড়র কর।

011	111	011
3	7	3

$(11111011)_2 = (373)_8$

(খ) বাইনারি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে -

১। বাইনারি সংখ্যার দশমিকের পরে বাম দিক থেকে প্রতি তিনটি বিট একত্রে নিয়ে গ্রুপ করে ডান দিকে আসতে হবে এবং ডান দিকের গ্রুপে খালি থাকলে 0 দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

২। এরপর প্রতিটি গ্রুপকে তার সমতুল্য অকটাল অংক (0 থেকে 7 পর্যন্ড়) দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। অংকগুলোকে বাম থেকে ডানে সাজালেই অকটাল ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে।

যেমন - $(.1111011)_2$ কে অকটাল সংখ্যায় রূপান্ড়র

.111	101	100
.7	5	4

$(.1111011)_2 = (.754)_8$

নিজে কর : $(11011.011)_2$ কে অকটালে রূপান্ড়র কর।

উঃ $(11011.011)_2 = (33.3)_8$

অকটাল নম্বরকে বাইনারি নম্বরে রূপান্ড়র

(১) অকটাল সংখ্যায় প্রতিটি ডিজিটকে ডান দিক থেকে আলাদা ভাবে তিন ডিজিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করতে হবে।

(২) বাইনারি নম্বরগুলোকে একত্রিত করলে অকটাল নম্বরের সমতুল্য বাইনারি নম্বর পাওয়া যাবে।

উদাহরণ:

$(425.37)_8$ -কে বাইনারিতে রূপান্ড়র কর।

4	2	5	.	3	7
↓	↓	↓		↓	↓
100	010	101		011	111

সুতরাং, $(425.37)_8 = (100010101.011111)_2$

বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্ড়র :

(ক) বাইনারি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে -

১। বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার রূপান্ড়র করতে হলে পূর্ণ সংখ্যায় জন্য ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের জন্য বাম দিক হতে ডান দিকে প্রতি চারটি বিট একত্রে নিয়ে গ্রুপ তৈরি করতে হবে। বাম অথবা ডান দিকের গ্রুপে খালি থাকলে 0 দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

২। এরপর প্রতিটি গ্রুপকে তার সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল অংক (0 থেকে 9 পর্যন্ড় এবং A, B, C, D, E, F)) দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। অংকগুলোকে বাম থেকে ডানে দিকে সাজালেই সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ- $(1111011)_2$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্ড়র।

0111	1011
7	B

$(1111011)_2 = (7B)_{16}$

উদাহরণ- $(.1111011)_2$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর:

.1111 0110
.F 6

$(1111011)_2 = (.F6)_{16}$

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

(১) হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে আলাদাভাবে চার ডিজিটের সমতুল্য বাইনারিতে পরিবর্তন করতে হবে।

(২) বাইনারি নম্বরগুলোকে একত্রিত করলেই হেক্সডেসিমেল নম্বরের সমতুল্য বাইনারি নম্বর পাওয়া যাবে।

উদাহরণ : $(6A.2F)_{16}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

6 A . 2 E
↓ ↓ ↓ ↓
0110 1010 0010 011

$(6A.2E)_{16} = (0110101000101110)_2$

অকটাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে যে, হেক্সাডেসিমেল-বাইনারি এবং অকটাল-বাইনারি রূপান্তর খুব সহজেই করা যায়।

(১) অকটাল সংখ্যাকে হেক্সডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে সংখ্যাটিকে 3টি করে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে।

(২) এরপর পূর্ণ নম্বরের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম দিক থেকে প্রতি 4টি বিট একত্রে নিয়ে একটি গ্রুপ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বশেষ গ্রুপে 4টি বিট নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 0 বসাতে হবে।

(৩) প্রতিটি গ্রুপের বাইনারি সমতুল্য হেক্সডেসিমেল মান লিখতে হবে এবং একত্রিত করতে হবে।

উদাহরণ : $(127)_8$ কে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর :

1 2 7
001 010 111
0101 0111
5 7

$(127)_8 = (57)_{16}$

হেক্সাডেসিমেল- অকটাল রূপান্তর :

$(12A)_{16}$ কে অকটালে রূপান্তর কর :

1 2 A
↓ ↓ ↓
0001 0010 1010

000 100 101 010
↓ ↓ ↓ ↓
0 4 5 2

$(12A)_{16} = (452)_8$

সার-সংক্ষেপ :

যে পদ্ধতির মাধ্যমে নম্বর বা সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ এবং গণনা করা হয় তাকে সংখ্যা বা নম্বর পদ্ধতি বলে।

ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি: আমাদের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশের জন্য বহুল ব্যবহৃত নম্বর পদ্ধতি হলো ডেসিমেল নম্বর বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। ডেসিমেল নম্বর পদ্ধতির ভিত্তি (Base) হলো 10। কারণ এই পদ্ধতিতে 10 টি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করা হয়।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি : বাই (Bi) মানে দুই। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 এবং 1 এ দুটি অংক ব্যবহার করা হয়।

অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি : অকটাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো 8, কেননা এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক প্রতীকের সংখ্যা আটটি।
হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি : হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস হলো 16 । এই পদ্ধতিতে 16 টি মৌলিক প্রতিক ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৮

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাইনারি পদ্ধতিতে লজিক অবস্থা কয়টি?
(ক) একটি (খ) দু'টি (গ) তিনটি (গ) চারটি

২। বাইনারি নম্বর $(10111)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল নম্বর কোনটি?
(ক) $(22)_{10}$ (খ) $(23)_{10}$ (গ) $(18)_{10}$ (গ) $(30)_{10}$

পাঠ-১০.৯ বাইনারি ও বুলিয়ান অপারেশন
Binary and Boolean Operation

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি –
- বাইনারি অপারেশন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুলিয়ান অপারেশন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৯.১ বাইনারি অপারেশন Binary Operation
ডেসিমেল পদ্ধতির গাণিতিক অপারেশনসমূহ বা প্রক্রিয়াসমূহ (যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) আমাদের নিকট অতি পরিচিত। এ ধরনের গাণিতিক অপারেশনসমূহ বাইনারি নম্বর পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক অপারেশনসমূহ অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর সহজ, কারণ এ ক্ষেত্রে মাত্র দুটি মৌলিক প্রতীক *0* এবং *1* ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা বাইনারি যোগ, বিযোগ, গুণ ও ভাগ অপারেশন সর্ম্পকে আলোচনা করব।

১। বাইনারি যোগ (Binary Addition)
বাইনারি যোগ অনেকটাই ডেসিমেল বা দশমিক যোগের অনুরূপ। বাইনারি যোগের সময় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

প্রথম ধাপ : বাইনারি যোগের সময় প্রথমে সর্ব ডানের কলাম যোগ করতে হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : প্রথম কলাম যোগ করে যোগফল প্রথম কলামের নিচে লিখতে হয়। যদি ক্যারি (carry) উৎপন্ন হয়, তবে তা পরের কলামে বসাতে হবে এবং পরের কলামে কোনো ডিজিট থাকলে তার সাথে ক্যারি যোগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ড় বাম দিকে কোনো কলাম না থাকে।

বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো প্রযোজ্য:

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 এবং হাতে 1 থাকবে অর্থাৎ ক্যারি 1 অর্থাৎ 10। এই হাতে থাকাকে ক্যারি (Carry) বলে।
1+1+1=1 এবং ক্যারি 1। অর্থাৎ ক্যারি 11।

গাণিতিক উদাহরণ : $(11001.101)_2 + (10101.010)_2 = ?$

সমধান :

$$\begin{array}{r} 11001.101 \\ 10101.010 \\ \hline 101110.111 \end{array}$$

উত্তর : $(101110.111)_2$

নিজে কর : $(1011)_2$ এর সাথে $(1001)_2$ যোগ কর। উঃ $(10100)_2$

২। বাইনারি বিয়োগ

বাইনারি নম্বর পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়ম অনেকটাই ডেসিমেল পদ্ধতির অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, বাইনারি পদ্ধতিতে যেহেতু মাত্র দুটি ডিজিট (0 এবং 1) থাকে, তাই বাইনারি বিয়োগে ডেসিমেল বিয়োগের থেকে কিছু বেশি ধার করার ধারণা থাকে। বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো প্রযোজ্যঃ

1. $0 - 0 = 0$
2. $1 - 0 = 1$
3. $1 - 1 = 0$
8. $0 - 1 = 1$ এবং ক্যারি 1।

এ পদ্ধতিতেও ডেসিমেল পদ্ধতির মতো ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করলে ধার নিতে হয়। যেমন- 0 থেকে 1 বিয়োগ করার জন্য 1 ধার নিতে হয়েছে। কম্পিউটারে এই পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হয় না । বিশেষ পদ্ধতিতে যোগের সাহায্যে বিয়োগ করা হয়।

গাণিতিক উদাহরণ : $(10101)_2$ থেকে $(1101)_2$ বিয়োগ কর।

$$\begin{array}{r} 10101 \\ -1101 \\ \hline 01000 \end{array}$$ উঃ $(01000)_2$

নিজে কর : $(1011)_2 - (0100)_2 = ?$ উঃ $(0111)_2$

৩। বাইনারি গুণ

বাইনারি গুণের নিয়ম ডেসিমেল গুণের মতোই, বরং ডেসিমেল গুণের চেয়েও সহজতর। বাইনারি গুণের জন্য চারটি নিয়ম নিম্নরূপ :

1. $0 \times 0 = 0$
2. $1 \times 0 = 0$
3. $0 \times 1 = 0$
4. $1 \times 1 = 1$

উদাহরণ : 101101

$$\begin{array}{r} 101 \\ \hline 101101 \\ 000000\times \\ 101101\times \\ \hline 11100001 \end{array}$$

নিজে কর : $(1111)_2 \times (0111)_2 = ?$ উ ঃ $(1101001)_2$

৪। বাইনারি ভাগ

বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ ডেসিমেল পদ্ধতির অনুরূপ। বাইনারি ভাগের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো প্রযোজ্য।

1. $0 \div 1 = 0$
2. $1 \div 1 = 1$
3. $1 \div 0$= অর্থহীন
4. $0 \div 0$= অর্থহীন

উদাহরণ : 10) 1010(101

10

10

10

সার-সংক্ষেপ :

বাইনারি যোগ: বাইনারি নম্বর পদ্ধতিতে যোগের নিয়ম:

0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1= 0 এবং হাতে 1 থাকবে অর্থাৎ ক্যারি 1 ।

বাইনারি বিয়োগ : বাইনারি নম্বর পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়ম।

1. 0 – 0 = 0
2. 1– 0 = 1
3. 1– 1= 0
4. 0 – 1 = 1 এবং ক্যারি 1

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.৯

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাইনারি $(10111)_2 + (1101)_2 = ?$

(ক) $(100101)_2$
(খ) $(100100)_2$
(গ) $(101100)_2$
(গ) $(101101)_2$

২। বাইনারি $(1101110)_2 - (10111)_2 = ?$

(ক) $(1010111)_2$
(খ) $(1010110)_2$
(গ) $(1010101)_2$
(গ) $(1011111)_2$

পাঠ-১০.১০ : লজিক গেইট
Logic Gate

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটের কার্যক্রম বিশেণ্ডষণ করতে পারবেন।

১০.১০. লজিক গেট
Logic Gate

লজিক গেট হলো লজিক বর্তনী তৈরির মূল উপাদান। লজিক বর্তনী হলো একটি ডিজিটাল বর্তনী। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। **লজিক গেট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার সাহায্যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ড় গঠন করা যায়। এসব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক বর্তনীকে লজিক গেইট বলে।**

একটি লজিক গেট -এ এক বা একাধিক ইনপুট থাকতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র আউটপুট থাকে। এই বর্তনীতে ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এদের বলা হয় লজিক গেট।

সুতরাং লজিক গেট বা যুক্তি বর্তনী হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যা এক বা একাধিক বাইনারি ইনপুট (1 এবং 0) গ্রহণ করে এবং একটি আউটপুট প্রদান করে। লজিক গেট ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, রোবট, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি: লজিক গেটে ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজের বিভিন্ন সম্ভাব্য মানের মধ্যে সর্ম্পক একটি টেবিল বা সারণির সাহায্য প্রকাশ করা হয়। এ টেবিলকে ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি বলা হয়।

লজিক গেটের প্রকারভেদ

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে তিনটি মৌলিক লজিক গেট ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো–

(১) OR গেট

(২) AND গেট

(৩) NOT গেট

এই তিনটি মৌলিক গেটের বিভিন্ন সমবায় বা সংযুক্তির মাধ্যমে আরো কিছু গেট তৈরি করা হয়। এগুলো হলো –

(ক) NAND গেট

(খ) NOR গেট

(গ) XOR গেট

(ঘ) XNOR গেট

(১) OR গেট (OR Gate) : OR গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট ও একটিমাত্র আউটপুট থাকে। এ গেটের আউটপুট ইনপুটগুলোর লজিক্যাল যোগের সমান হয়। যে কোনো একটি বা সকল ইনপুট এর মান 1 হলে আউটপুট পাওয়া যাবে 1। দুটি ইনপুট যথাক্রমে A ও B হলে এবং আউটপুট X হলে, OR গেটের বুলিয়ান সমকিরণ হবে, $X = A + B$

এখানে + চিহ্ন দ্বারা OR ক্রিয়া বুঝনো হয়েছে। চিত্রে OR গেটের সত্যক সারণি এবং প্রতীক দেখানো হয়েছে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

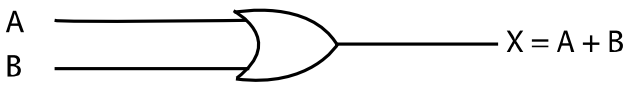

চিত্র ১০.২৪ (ক)

১০.২৪(খ) চিত্রে OR গেটের সমতুল্য একটি সমান্ড়রাল সুইচ বর্তনী দেখানো হয়েছে। এই সমান্ড়রাল সুইচ বর্তনীর যে কোনো একটি সুইচ অন করলেই বাতিটি জ্বলবে। আবার দুটি সুইচ এক সঙ্গে অন করলেও বাতিটি জ্বলবে।

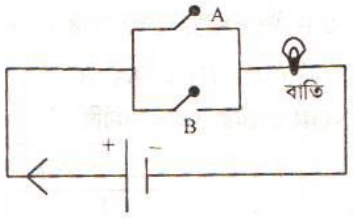

চিত্র ১০.২৪ (খ)

(২) AND গেট : AND গেটে দুই বা দুইয়ের অধিক ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে। AND গেটের সকল ইনপুট 1 হলেই কেবল মাত্র আউটপুট 1 হবে। অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। AND গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো –

$X = A \text{ AND } B = A \cdot B = AB$

এই সমীকরণে '.' চিহ্নটি বুলিয়ান AND অপারেশান নির্দেশ করে। ১০.২৫(ক) চিত্রে AND গেটের সত্যক সারণি এবং প্রতিক দেখানো হলো।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

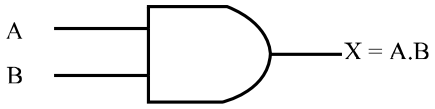

চিত্র ১০.২৫(ক)

১০.২৫(খ) চিত্রে AND গেটের সমতুল্য একটি সার্কিট বা বর্তনী দেখানো হলো। এ সার্কিটে দুটি সুইচ A ও B শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত রয়েছে। এই সুইচ দুটির যে কোনো একটি সুইচ অন করলেই বাতিটি জ্বলবে না। কেবলমাত্র দুটি সুইচ একসাথে অন করলেই বাতিটি জ্বলবে।

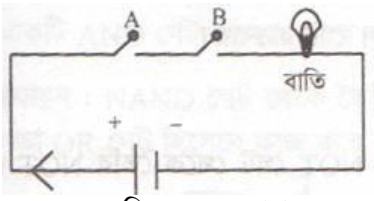

চিত্র ১০.২৫ (খ)

৩। NOT গেট (NOT Gate) : Not গেটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট সব সময় ইনপুটের বিপরীত হয়। এজন্য Not গেটকে Inverter বলা হয়। Not গেটের ইনপুট 1 হলে আউটপুট হবে 0 এবং ইনপুট 0 হলে আউটপুট হবে 1।

NOT গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো : $X = \text{NOT } A$

$= \overline{A}$ |

[১০.২৬(ক)] চিত্রে NOT গেটের সত্যক সারণি এবং প্রতিক দেখানো হয়েছে।

ইনপুট	আউটপুট
A	$X = \overline{A}$
0	1
1	0

NOT গেটের সত্যক সারণি (Truth Table)

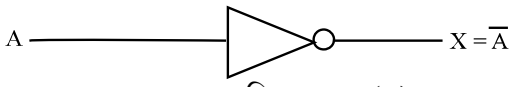

চিত্র ১০.২৬(ক)

[১০.২৬(খ)] চিত্রে NOT গেটের সমতুল্য একটি বৈদ্যুতিক বর্তনী দেখানো হলো। এই বর্তনীর সুইচটি অফ থাকলে (0) বাল্বটি জ্বলবে (1)। কিন্তু সুইচটি বন্ধ থাকলে (1) বাল্বটি জ্বলবে না (0) যা NOT গেটের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

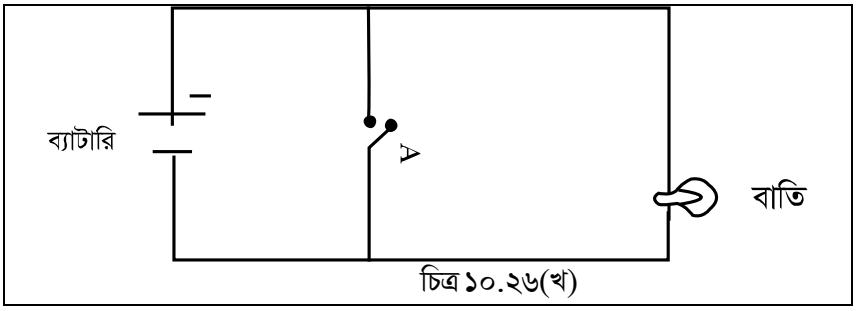

চিত্র ১০.২৬(খ)

সার-সংক্ষেপ :

লজিক গেইট : লজিক গেট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার সাহায্যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ড় গঠন করা যায়। এসব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক বর্তনীকে লজিক গেইট বলে।

ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি: লজিক গেটে ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজের বিভিন্ন সম্ভাব্য মানের মধ্যে সম্পর্ক একটি টেবিল বা সারণির সাহায্য প্রকাশ করা হয়। এ টেবিলকে ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি বলা হয়।

OR গেট : OR গেটে দুই বা ততোধিক ইনপুট ও একটিমাত্র আউটপুট থাকে। যে কোনো একটি বা সকল ইনপুট এর মান 1 হলে আউটপুট পাওয়া যাবে 1।

AND গেট : AND গেটে দুই বা দুইয়ের অধিক ইনপুট এবং একটি আউটপুট থাকে। AND গেটের সকল ইনপুট 1 হলেই কেবল মাত্র আউটপুট 1 হবে। অন্যথায় আউটপুট 0 হবে।

NOT গেট : Not গেটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট সব সময় ইনপুটের বিপরীত হয়। এজন্য Not গেটকে Inverter বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.১০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি মৌলিক গেট নয়?

(ক) OR (খ) AND (গ) NAND (গ) NOT

২। AND গেট সমর্থন করে–

(i) শ্রেণি সমবায় (ii) সমান্ড়রাল সমবায় (iii) মিশ্র সমবায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (গ) i, ii ও iii

পাঠ ১০.১১ গেটের সমবায়
Combination of Gates

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটের সমবায় বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.১১.১ গেটের সমবায়
Combination of Gates

বিভিন্ন মৌলিক গেটের সমন্বয়ে যে সব গেট গঠন করা হয় তাদেরকে সমন্বিত গেট বা যৌগিক গেট বলে। যৌগিক গেট তৈরি করার এ পদ্ধতিকে গেটের সমবায় বলে। তিনটি মৌলিক গেট OR, AND এবং NOT গেটের সমন্বয়ে চারটি যৌগিক গেট গঠন করা যায়। এগুলো হলো –

(১) NOR গেট
(২) NAND গেট
(৩) XOR গেট
(৪) XNOR গেট

(১) NOR গেট (NOR গেট): NOR গেট প্রকৃতপক্ষে OR গেট ও NOT গেটের সমবায়। OR গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করলে NOR গেট তৈরি হয়। OR গেট যে কাজ করে এই গেট তার বিপরীত কাজ করে। অর্থাৎ দুইটি ইনপুট যখন 0 হবে তখনই আউটপুট 1 হবে। আবার যতি কোন ইনপুট 1 হয় তবে আউটপুট অবশ্যই 0 হবে।

NOR গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো :

$X = NOT\ (A + B\ ) = \overline{A + B}$

[১০.২৭] চিত্রে NOR গেটের সত্যক সারণি ও প্রতীক দেখানো হলো:

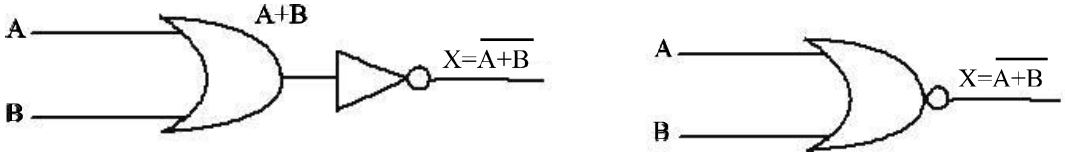

চিত্র ১০.২৭

NOR গেটের সত্যক সারণি

ইনপুট		আউটপুট	
		OR গেট	NOR গেট
A	B	A+B	$X = \overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

(২) NAND গেট **(NAND Gate) :** NAND গেট হচ্ছে AND গেট ও NOT গেটের সমন্বিত রূপ। AND গেট থেকে নির্গত সংকেতটি NOT গেটের মধ্যদিয়ে প্রেরণ করলে NAND গেটের কাজ হয়। অর্থাৎ AND গেটের সাথে NOT গেট যুক্ত করে NAND গেট তৈরি করা হয়। AND **গেট** যে কাজ করে এই গেট তার বিপরীত কাজ করে। অর্থাৎ দুটি ইনপুট

1 হলে গেটের আউটপুট 0 হবে, এবং কোন একটি ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে। NAND গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো, $X = \overline{A.B}$

[১০.২৮] চিত্রে NAND গেটের সত্যক সারণি ও প্রতীক চিত্র দেখানো হলো :

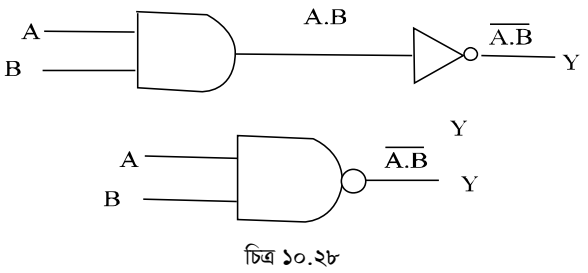

চিত্র ১০.২৮

		আউটপুট	
		AND গেট	NAND গেট
A	B	AB	$X = \overline{A}\overline{B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি।

(৩) XOR গেট **(XOR Gate) : Exclusive OR** গেটকে সংক্ষেপে XOR গেট বলা হয়। OR গেট, AND গেট এবং NOT গেট সংযুক্ত করে XOR গেট তৈরি করা হয়। এই গেটের দুটি ইনপুট সমান না হলে আউটপুট 1 হয়। অর্থাৎ যখন যে কোনো একটি মাত্র ইনপুট 1 কিন্তু অন্য ইনপুট 1 হবে না, তখনই শুধু আউটপুট 1 হবে। সুতরাং আউটপুট 0 হবে যখন ইনপুটগুলো একই (0, 0 অথবা 1, 1) হবে। দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য XOR গেট ব্যবহার করা হয় ।

XOR গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো :

$$X = A \oplus B$$
$$= \overline{A}B + A\overline{B}$$

এখানে $\oplus$ চিহ্ন দ্বারা XOR গেটের ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে।

[১০.২৯] চিত্রে XOR গেটের সত্যক সারণি এবং প্রতীক চিত্র দেখানো হয়েছে।

XOR গেটের সত্যক সারণি :

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

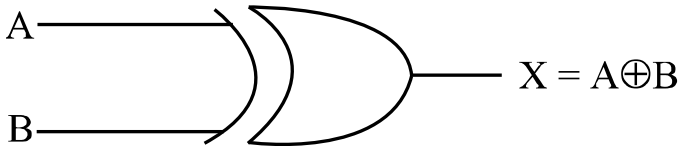

চিত্র ১০.২৯

(৪) XNOR গেট (XNOR Gate) : XOR গেটের সাথে NOT গেট যোগ করে XNOR গেট পাওয়া যায়। XOR গেটের আউটপুটকে NOT গেট দিয়ে প্রেরণ করলে XNOR গেট গঠিত হয়। সুতরাং XOR গেট যে কাজ করে XNOR গেট তার বিপরীত কাজ করে। অর্থাৎ ইনপুটে বিজোড় সংখ্যক 1 থাকলে আউটপুট 0 এবং XNOR গেটের বুলিয়ান সমীকরণ হলো–

$$X = A \oplus B$$
$$= AB + \overline{AB}$$

[১০.৩০] চিত্রে XNOR গেটের সত্যক সারণি ও প্রতীক চিহ্ন দেখানো হলো।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

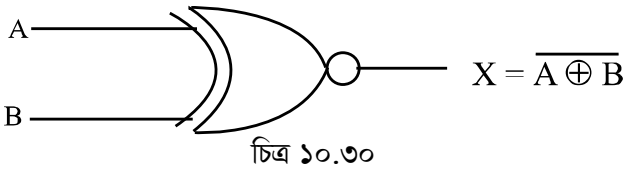

চিত্র ১০.৩০

১০.১২ ব্যবহারিক -৭

পরীক্ষণের নাম :

ডায়োডের পূর্ণ ব্রিজ ব্যবহার করে একটি দিক পরিবর্তী প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে রূপান্তর।

তত্ত্ব : দৈনন্দিন জীবনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চালনা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন একমুখী প্রবাহ বা ডিসি প্রবাহের প্রয়োজন হয়। ব্যাটারি বা শুষ্ক কোষই হচ্ছে একমুখী প্রবাহের প্রধান উৎস। কিন্তু এদর ভোল্টেজ বেশ কম এবং প্রায়ই এগুলোকে পরিবর্তন করতে হয় বিধায় বেশ ব্যয়বহুল। এজন্য বৈদ্যুতিক লাইনের এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। যে পদ্ধতিতে এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয় তাকে বলা হয় রেকটিফিকেশন বা একমুখীকরণ।

পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ারে এসি ইনপুট ভোল্টেজ এর উভয় অর্ধচক্রের জন্য তড়িৎপ্রবাহ লোডের মধ্য দিয়ে একই দিকে প্রবাহিত হয়। একটি ব্রিজ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে দুই জোড়া অর্থাৎ চারটি ডায়োড ব্যবহার করা হয়। ইনপুট এসি ভোল্টেজের ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য এক জোড়া ডায়োড সম্মুখী ঝোঁক লাভ করে এবং অপর জোড়া ডায়োড বিমুখী ঝোঁকে থাকে। সিগনাল বা সংকেতের ঋণাত্মক অর্ধচক্রের জন্য অপর এক জোড়া ডায়োড সম্মুখী ঝোঁকে থাকে ও অন্য জোড়া ডায়োড বিমুখী ঝোঁকে থাকে। এভাবে এসি ইনপুটের উভয় অর্ধ চক্রেই লোডের মধ্য দিয়ে একই দিকে একমুখী আউটপুট সৃষ্টি করে। স্পন্দন বিশিষ্ট আউটপুট ভোল্টেজের এসি অংশকে বাদ দেয়ার জন্য ফিল্টার বর্তনী ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রপাতি : স্টেপডাউন ট্রান্সফর্মার, চারটি ডায়োড, লোড রেজিস্ট্যান্স, সংযোগ তার, ব্রেড বোর্ড (Bread Board), ধারক, রোধক ভোল্টমিটার, অসিলোস্কোপ ইত্যাদি।

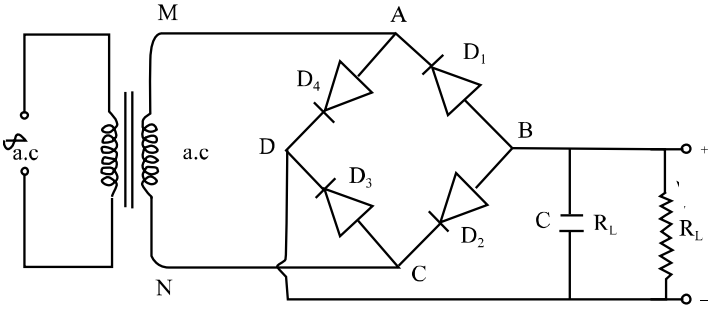

চিত্র : ১০.৩১ (ক)

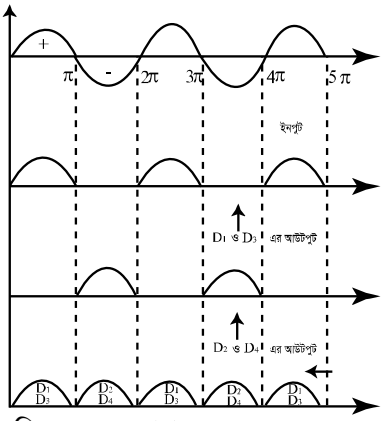

চিত্র ১০.৩১ (খ)

বর্তনী সংযোগ : D_1, D_2, D_3 এবং D_4 ডায়োড চারটি দিয়ে চিত্র ১০. ৩১ (ক) এর ন্যায় একটি ব্রিজ গঠন করা হয় যে এসি ভোল্টেজকে একমুখী করতে হবে সেটি একটি ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে ব্রিজের দুই বিপরীত কৌণিক বিন্দুতে সংযোগ দেওয়া হয়। ব্রিজের অন্য দুই কৌণিক বিন্দুর মাঝে লোড রেজিস্ট্যান্স R_L কে সংযুক্ত করা হয়।

কার্যপদ্ধতি (Procedure)

১। চিত্র ১০.৩১ (ক) অনুসারে বর্তনী সংযোগ দেয়া হলো। গৌণ কুন্ডলীর ধনাত্মক অর্ধচক্রের জন্য ট্রান্সফর্মারের M প্রান্ড় ধনাত্মক এবং N প্রান্ড় ঋণাত্মক হয়। ফলে ডায়োড D_1 ও D_3 সম্মুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয় এবং ডায়োড D_2 ও D_4 বিমুখী ঝোঁক লাভ করে। যার ফলে শুধুমাত্র এবং D_2 ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। সুতরাং তড়িৎ প্রবাহ MABEDCN পথ বরাবর চলে এবং লোড R_L এর বিপরীতে বিভব পতন ঘটে যা R_L এর দুই প্রান্ড়ে সংযুক্ত ওসিলোস্কোপে দেখা যায় [চিত্র ১০.৩১ (ক)]।

২। গৌণ কুন্ডলীর ঋণাত্মক অঘর্ধচক্রের জন্য ট্রান্সফর্মারের M প্রান্ড় ঋণাত্মক এবং N প্রান্ড় ধনাত্মক হয়। ফলে ডায়োড D_2, ও D_4 সম্মুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয় এবং D_1, D_3 বিমুখী ঝোঁক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মুধুমাত্রা D_2 ও D_4 ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। সুতরাং তড়িৎপ্রবাহ MABEDCN পথ বরাবর চলে এবং লোড R_L এর বিপরীতে বিভব পতন ঘটে এবং ওসিলোস্কোপে দেখা যায়।

সুতরাং চিত্র ১০.৩১ (ক) হতে দেখা যায় যে, লোড রেজিস্ট্যান্স R_L এর ভিতর দিয়ে প্রবাহ একই দিকে চলে।

৩। ইনপুট ও আউটপুট ভোল্টেজের আকার অসিলোস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হলো। R_L এর দুই প্রান্ড়ে ভোল্টমিটার সংযোগ দিয়ে ডিসি আউপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করা হলো।

ফলাফল : ইনপুটে প্রদত্ত এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজে রূপান্ড়রিত করা হলো এবং অসিলোসেকাপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হলো।

সতর্কতা : (১) ডায়োডের পোলারিটি নিশ্চিত করে বর্তনীতে সংযুক্ত করতে হবে।

(২) বর্তনী সংযোগ সতর্কতার সাথে করতে হবে।

১০.১৩ ব্যবহারিক-৮

পরীক্ষণের নাম :

সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করে OR, AND, NOT গেট বর্তনীর ক্রার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই।

To vrify The truth table of OR, AND, NOT logic gate using Integrated circuit.

ব্যবহারিক ৮.১ : সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করে OR গেট বর্তনীর কার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই।

তত্ত্ব : লজিক গেট হলো বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজাবরা বাস্ড়বায়ন করা যায়। এর এক বা একাধিক ইনপুট থাকে এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। যে লজিকগেট এর দুই বা দুই এর অধিক ইনপুট কিন্তু একটি মাত্র আউটপুট থাকে এবং এর যে কোনো একটি ইনপুট উচ্চ বিভব হলেই আউটপুট উচ্চ বিভব হয়, তাছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আউটপুট বিভব নিম্ন হয় তাকে OR গেট বলে। OR গেটের ইনপুট A এবং B হলো, আউটপুট,

$$Y = A + B$$

উদ্দেশ্য : OR গেটের কার্যক্রম সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করে যাচাই করণ।

যন্ত্রপাতি :

(১) ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড
(২) IC (7432)
(৩) LED বাতি
(৪) সুইচ
(৫) সংযোগ তার

বর্তনী সংযোগ : ১০.৩২ নং চিত্র অনুসারে IC (7432) এর বর্তনী সংযোগ দেখানো হলো।

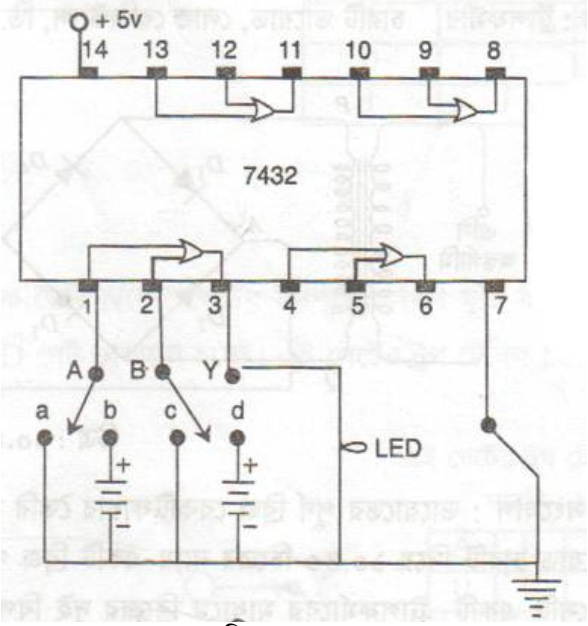

চিত্র : ১০.৩২

লজিক অবস্থান : '0' = 0V

`1' = +5V

কাজের ধারা :

(১) 7432 আইসি চিত্র ১০.৩২ এর ন্যায় ট্রেইনার বোর্ডে বসাতে হবে।

(২) IC এর 1 ও 2 নম্বর পিন ইনপুট A ও B এর সাথে এবং 3 নম্বর পিন আউটপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। IC এর 7 নম্বর পিন ভূমির সাথে এবং 14 নম্বর পিন +5V এর সাথে সংযোগ দিতে হবে। 3 নং পিন ট্রেইনার বোর্ডে LED বা ভোল্টমিটারের সাথে সংযোগ দিতে হবে।

(৩) এখন ইনপুট A ও B কে যথাক্রমে a ও c এর সাথে স্পর্শ করিয়ে ইনপুট দুটিতে শুন্য বিভব প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে লজিক অবস্থা হলো, A = 0, B = 0 এবং আউটপুট X= 0

(৪) এখন ইনপুট A ও B কে যথাক্রমে a ও d বা b ও c এর সাথে স্পর্শ করিয়ে ইনপুট দুটিকে যথাক্রমে শূন্য বিভব এবং উচ্চ বিভব বা উচ্চ বিভব ও শূন্য বিভব প্রয়োগ করা হয়। দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে LED জ্বলছে। এক্ষেত্রে লজিক অবস্থা হলো, A= 0, B=1 এবং

X= 1 অথবা A= 1, B=0 এবং X=1।

(৫) এবার A ও B কে যথাক্রমে b ও d এর সাথে স্পর্শ করিয়ে উভয় ইনপুটে উচ্চ বিভব প্রয়োগ করা হয়। দেখা যায় যে, এ অবস্থায়ও LED জ্বলছে। এক্ষেত্রে লজিক অবস্থা হবে, A= 1, B=1 এবং X=1।

পর্যবেক্ষণ ঃ

পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ ও সত্যক সারণি উপস্থাপন করা হলো (ছক-১, ছক–২)।

OR গেটের কার্যক্রম

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A+B
নিম্ন	নিম্ন	LED জ্বলছেনা
নিম্ন	উচ্চ	LED জ্বলে
উচ্চ	নিম্নে	LED জ্বলে
উচ্চ	উচ্চ	LED জ্বলে

ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A+B
0	0	0
O	1	1
1	0	1
1	1	1

ফলাফল : OR গেটের কার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই করা হলো।

সর্তকতা :

১। ট্রেইনার বোর্ডে সকল সংযোগ দৃঢ়ভাবে দিতে হবে।

২। 14 নম্বর পিন ট্রেইনার বোর্ডে +5V এর সাথে যুক্ত করতে হবে।

৩। খেয়াল রাখতে হবে যেন IC এর পিন বেঁকে বা ভেঙ্গে না যায়।

ব্যবহারিক -৮.২ পরীক্ষণের নাম : সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করে AND গেট বর্তনীর কার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই।

তত্ত্ব : লজিক গেট হলো এক বিশেষ ধরণের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজাবরা বাস্ড়বায়ন করা যায়। যে লজিক গেটে দুই বা তথোধিক ইনপুট থাকে কিন্তু আউটপুট থাকে এবং এর দুই ইনপুটে যখন উচ্চ বিভব থাকে, তখন আউটপুটে উচ্চ বিভব থাকবে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আউটপুট বিভব নিম্ন হবে তাকে AND গেট বলে। AND গেটের ইনপুট A এবং B হলো আউটপুট,

$$X = A.B$$

যন্ত্রপাতি :

(১) ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড
(২) IC (7408)
(৩) LED বাতি
(৪) সুইচ
(৫) সংযোগ তার

বর্তনী সংযোগ : AND গেটের আইসি (7408) সংযোগ ১০.৩৩ চিত্রে দেখানো হলো।

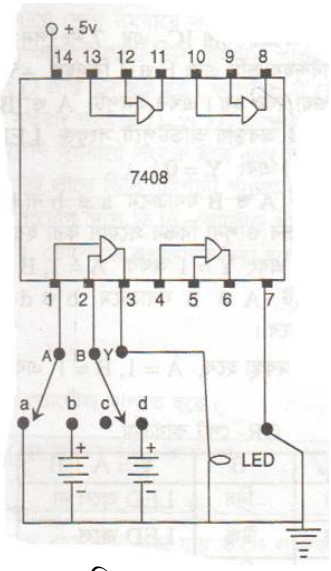

চিত্র : ১০.৩৩

লজিক অবস্থান : '0' = 0V
'1' = 5V

কাজের ধারা :

(১) 7408 আইসি (১০.৩৩) চিত্রের ন্যায় ট্রেইনার বোর্ডে বসাতে হবে।

(২) IC এর 1 ও 2 নম্বর পিন ইনপুট A ও B এর সাথে এবং 3 নম্বর পিন আউটপুটের সাথে সংযুক্ত করতে হবে IC এর 7 নম্বর পিন ভূমির সাথে এবং 14 নম্বর পিন +5V এর সাথে সংযোগ দিতে হবে। 3 নম্বর পিন ট্রেইনার বোর্ডে LED বা ভোল্টমিটারের সাথে সংযোগ দিতে হবে।
(৩) ট্রেইনার বোর্ডে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে হবে।
(৪) আইসি-তে চার সেট ইনপুট (A, B) এবং চারটি আউটপুট (X) আছে। সুইচ এর অবস্থার পরিবর্তন করে অর্থাৎ অফ-অন করে প্রতি সেটের জন্য আউটপুট বা LED এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ঃ পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ ও সত্যক সারণি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

AND গেটের কার্যক্রম

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A.B
নিম্ন	নিম্ন	LED জ্বলছেনা
নিম্ন	উচ্চ	LED জ্বলে না
উচ্চ	নিম্ন	LED জ্বলে না
উচ্চ	উচ্চ	LED জ্বলে

ট্রুথ টেবিল

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ফলাফল : **AND** গেট বর্তনীর কার্যক্রম যাচাই করা হলো।

সর্তকতা :

১। ট্রেইনার বোর্ডে সকল সংযোগ দৃঢ়ভাবে দিতে হবে।
২। 14 নম্বর পিন ট্রেইনার বোর্ডে +5V এর সাথে যুক্ত করতে হবে।
৩। খেয়াল রাখতে হবে যেন IC এর পিন বেঁকে বা ভেঙ্গে না যায়।

ব্যবহারিক-৮ : পরীক্ষণের নাম : সমন্বিত বর্তনী ব্যবহার করে NOT গেট বর্তনীর কার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই।

তত্ত্ব : লজিক গেট হলো এক বিশেষ ধরণের ইলেকট্রনিক বর্তনী যার দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজাবরা বাস্ড়বায়ন করা যায়। যে লজিক গেটে একটি মাত্র ইনপুট ও একটি মাত্র আউটপুট থাকে এবং ইনপুটে নিম্ন বিভব প্রয়োগ করলে আউটপুটে উচ্চ বিভব এবং ইনপুটে উচ্চ বিভব প্রয়োগ করলে আউটপুটে নিম্ন বিভব পাওয়া যায় তাকে **NOT গেট বলে। NOT গেটের ইনপুট** A এবং আউটপুট X হলে,

$$X = \bar{A}$$

যন্ত্রপাতি :

(১) ডিজিটাল ট্রেইনার বোর্ড
(২) IC (7404)
(৩) LED বাতি
(৪) সুইচ
(৫) সংযোগ তার

বর্তনী সংযোগ : **AND গেটের আইসি (7408) সংযোগ** ১০.৩৪ চিত্রে দেখানো হলো।

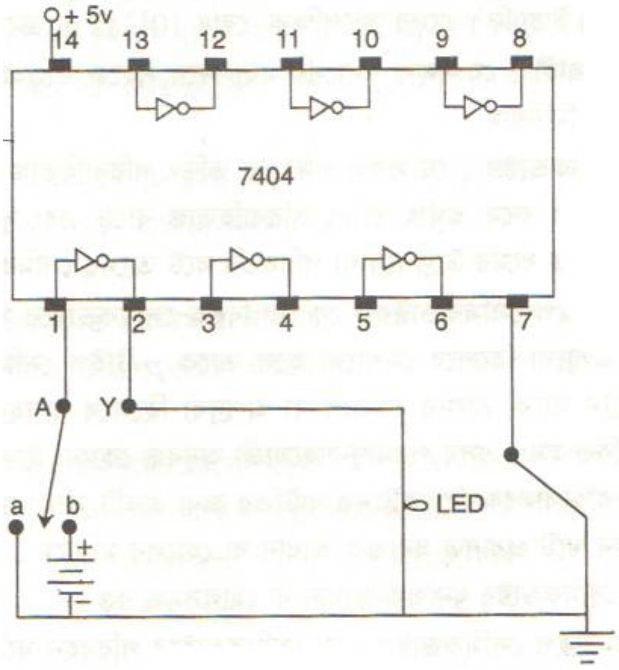

চিত্র : ১০.৪

লজিক অবস্থান : '0' = 0V

`1' = +5V

কাজের ধারা :

(১) 7404 আইসি চিত্র ১০.৩৪ এর ন্যায় ট্রেইনার বোর্ডে বসাতে হবে।

(২) IC এর 7 নম্বর পিন ভূমির সাথে এবং 14 নম্বর পিন +5V পাওয়ার সাপণ্ডাইয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। IC এর 1 নম্বর পিন ইনপুট A এর সাথে এবং 2 নম্বর পিন আউটপুটের LED এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

(৩) ইনপুট A কে 'a' বিন্দুতে স্পর্শ করিয়ে শূন্য বিভব প্রয়োগ করা হয়। দেখা যায় যে, আউটপুটের সাথে সংযুক্ত LED জ্বলে ওঠে। এক্ষেত্রে লজিক অবস্থা হলো : A= 0, X=1।

(৪) এবার ইনপুট A কে 'b' বিন্দুতে স্পর্শ করিয়ে +5V বিভব অর্থাৎ উচ্চ বিভব প্রয়োগ করা হলো। দেখা যায়, যে LED জ্বলে না। অর্থাৎ যখন, A= 1, X=O।

পর্যবেক্ষণ ঃ

পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ ও সত্যক সারণি উপস্থাপন করা হলো

NOT গেটের কার্যক্রম

0	আউটপুট
A	$X = \bar{A}$
নিম্ন	LED জ্বলে
উচ্চ	LED জ্বলে না

ট্রুথ টেবিল

ইনপুট	আউটপুট
A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

ফলাফল : **NOT** গেট বর্তনীর কার্যক্রম (ট্রুথ টেবিল) যাচাই করা হলো।

সর্তকতা :

১। OR গেট এর পরীক্ষায় অনুরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১০.১১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। XNOR গেটের আউটপুট 1 হবে, যখন ইনপুট দুটি হবে–

(i) 0 এবং 0

(ii) 0 এবং 1

(iii) 1 এবং 1

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

২। নিচের কোন লজিক গেটটি নিম্নবর্ণিত সত্যক সারণিকে সমর্থন করে।

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(ক) NAND

(খ) AND

(গ) XOR

(গ) OR

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে–

(i) অর্ধপরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায় (ii) অর্ধপরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়

(iii) পরিবাহীর পরিবাহিতা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নিচের কোন জাতীয় পদার্থে শক্তি ব্যবধান সবচেয়ে বেশি?

(ক) ধাতু (খ) অতি পরিবাহী (গ) অন্ড়রক (ঘ) অর্ধপরিবাহী

৩। হোল সৃষ্টি হয় কোন ব্যান্ডে?

(ক) যোজন ব্যান্ডে (খ) পরিবহন ব্যান্ডে (গ) নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধানে (ঘ) শক্তি ব্যান্ডে

৪। একটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে, গরিষ্ঠ আধান বাহক হলে–

(ক) হোল (খ) ইলেকট্রন (গ) প্রোটন (ঘ) নিউট্রন

৫। যদি কোনো ডায়োডে সম্মুখী ঝোঁক বৃদ্ধি করা হয়, ডিপেণ্ডশন স্ড়রের প্রস্থ–

(ক) ওঠানামা করে (খ) হ্রাস পায় (গ) বৃদ্ধি পায় (ঘ) ওঠানামা করে না

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৬। একটি বিশুদ্ধ সিলিকন অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে –

(i) পরিবহন ব্যান্ড প্রায় খালি থাকে (ii) শক্তি ব্যবধান Eg-এর মান প্রায় 0.7cV

(ii) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সটিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭। হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রতীক হলো–

(ক) 2 টি (খ) 8 টি (গ) 10 টি (গ) 16 টি

৮। OR গেটের আউটপুট কখন 1 হবে?

(ক) যখন উভয় ইনপুট '0' হয় (খ) যখন যে কোন একটি ইনপুট '0' হয়

(গ) কেবলমাত্র, উভয় ইনপুট '1' হলে (গ) যখন যে কোন একটি বা উভয় ইনপুট '1' হলে

(ঘ) সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

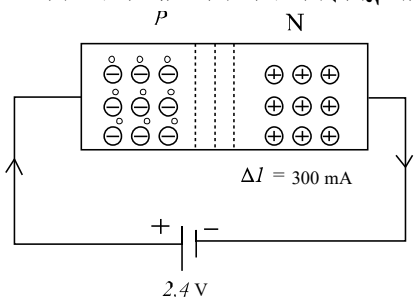

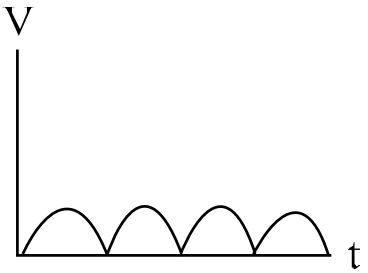

(ক) শক্তি ব্যান্ড কী? ১

(খ) অর্ধপরিবাহীর রোধের উষ্ণতা সহগ ঋণাত্মক ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) ১ম চিত্রে বায়াস ভোল্টেজ 2.4 V থেকে বাড়িয়ে 2.50 V করা হলে জাংশনটির গতীয় রোধ নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) উদ্দীকের চিত্র -১ হতে চিত্র-২ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বর্তনী চিত্র অংকন কর এবং ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২। একটি কমন বেস সংযোগে থাকা ট্রানজিস্টারের নিঃসারক ও বেস প্রবাহ যথাক্রমে 0.85 mA ও 0.05 mA

(ক) ডোপিং কী? ১

(খ) ট্রানজিস্টারের বেস অংশ পাতলা হয় কেন? ব্যাখ্যা দাও। ২

(গ) উদ্দীপকের ট্রানজিস্টারটির প্রবাহ বিবর্ধন গুণক নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) নিঃসারক ও বেস প্রবাহদ্বয় দ্বিগুণ করা হলে ট্রানজিস্টারটির প্রবাহ লাভের পরিবর্তন গাণিতিকভাবে বিশেণ্ডষণ কর। ৪

(ঙ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। শক্তি স্ড়র ও শক্তি ব্যান্ড বলতে কী বুঝ?

২। যোজন ব্যান্ড বলতে কী বোঝ?

৩। পরিবহন ব্যান্ড কী বোঝ?

৪। নিষিদ্ধ ব্যান্ড বলতে কী বোঝ?

৫। অর্ধপরিবাহী কাকে বলে?

৬। অর্ধপরিবাহীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৭। ডোপিং কী ?

৮। যোজন ইলেকট্রন কী?

৯। মুক্ত ইলেকট্রন কী?

১০। অর্ধপরিবাহী ডায়োড কী?
১১। লঘিষ্ঠ আধান বাহক কী?
১২। গরিষ্ঠ আধান বাহক বলতে কী বুঝ?
১৩। ট্রানজিস্টর কী?
১৪। p-n জাংশন কী
১৫। জেনার বিভব কী?
১৬। জেনার ক্রিয়া বলতে কী বুঝ?
১৭। অ্যাম্পলিফায়ার কী?
১৮। লজিক গেট কাকে বলে?
১৯। OR কাকে বলে?
২০। NOT কাকে বলে?
২১। AND গেট কী?

(চ) বিশদ উত্তর প্রশ্ন :

১। ব্যান্ড তত্ত্ব কী? ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অন্ড়রক বস্তুর আচরণ ব্যাখ্যা কর।
২। ইনট্রিন্সিক বা সহজাত অর্ধ পরিবাহী ও এক্সট্রিন্সিক বা বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলতে কী বুঝ?
৩। একটি *p*- টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন কৌশল বর্ণনা কর।
৪।একটি *n*-টাইপ অর্ধপরিবাহীর গঠন কৌশল ব্যাখ্যা কর।
৫। অর্ধপরিবাহী ডায়োডে সম্মুখী ঝোঁক ও বিমুখী ঝোঁক বলতে কী বুঝ?
৬। পূর্ণ-তরঙ্গ ব্রীজ রেকটিফায়ারের সাহায্যে একটি দিক পরিবর্তী প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে রূপান্ড়রিত করা যায় বর্ণনা কর।
৭। একটি *p-n-p* ট্রানজিস্টরের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।
৮। একটি *n-p-n* ট্রানজিস্টরের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা কর।
৯। অ্যামপিণ্ডফায়ার হিসেবে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার আলোচনা কর।
১০। নম্বর পদ্ধতি কী? দশমিক, বাইনারি, অকটাল ও হেক্সাডেসিমেল নম্বর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
১১। দশমিক, বাইনারি, অকটাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার মৌলিক প্রতিক এবং ভিত্তি লেখ।
১২। 1 থেকে 16 পর্যন্ড় দশমিক সংখ্যাগুলোর সমকক্ষ বাইনারি, অকটাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা নির্ণয় কর।
১৩। প্রতিকসহ তিনটি মৌলিক গেটের সত্যক সারণী লেখ।
১৪। মৌলিক লজিক গেটগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ছ) গাণিতিক সমস্যা

১। একটি *p–n* জংশনে 2 V বিভব পার্থক্যের জন্য তড়িৎ প্রবাহ 600 mA এবং 2.3 V বিভব পার্থক্যের জন্য তড়িৎ প্রবাহ 900 mA হলে এর গতীয় রোধ কত? [উ: 1.0Ω]
২। ১০.২ : একটি *p - n* জংশন সম্মুখী ঝোঁকে আছে। বিভব পার্থক্য 2.2 V থেকে বৃদ্ধি করে 2.4 V করায় এর প্রবাহমাত্রা 400 mA বৃদ্ধি পেল। জংশনের গতীয় রোধ কত? [উ: 0.5 Ω]
৩। একটি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে $\alpha = 0.95$ এবং $I_E = 1$ mA হলে β কত? [উ: 19]
৪। একটি কমন বেস টানজিস্টরে কালেক্টর প্রবাহ 0.85 mA এবং বেস প্রবাহ 0.05 mA । এর প্রবাহ বিবর্ধন গুণক নির্ণয় কর। [উ: 0.944]
৫। একটি কমন বেস ট্রানিজস্টর এমিটার কারেন্ট 100 μA থেকে 150 μA এ বৃদ্ধি করায় এর কালেক্টর কারেন্ট 98 μA থেকে 147 μA এ উন্নীত হলো। এর প্রবাহ বিবর্ধন গুণক নির্ণয় কর। [উ: 0.98]
৬। $(19.375)_{10}$ কে বইনারি সংখ্যায় রূপান্ড়র কর। [উ: $(10011.011)_2$]
৭। বাইনারি সংখ্যা $(1111)_2$ হলে ডেসিমেল সংখ্যাটি বের কর। [উ: $(15)_{10}$]
৮। ডেসিমেল সংখ্যা $(45)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তিত কর। [উ: $(101101)_2$]

৯। $(101001)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর। [উঃ $(41)_{10}$]

১০। $(25)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর। [উঃ $(11001)_2$]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১ : ১. (গ) ২. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২ : ১. (গ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩ : ১. (গ) ২. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৪ : ১. (গ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৫ : ১. (ক) ২. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৬ : ১. (খ) ২. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৭ : ১. (ক) ২. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৮ : ১. (খ) ২. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৯ : ১. (খ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১০ : ১. (গ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১১ : ১. (খ) ২. (খ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গ	গ	ক	ক	খ	ঘ	ঘ	ঘ